উৎসর্গ

শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

কাকাবাবু

শ্রীচরণেষু

ভাগলপুর

অদৃশ্যলোকে

১

একমুখ গোঁফ দাড়িওয়ালা লোক—মাথায় বাবরি চুল কপালে সিঁদুরের ফোঁটা—চোখে দুটোতে অস্বাভাবিক রকম প্রখর দীপ্তি। হঠাৎ দেখলে কাপালিক বলে' সন্দেহ হয়। সাইকেল চড়ে' রোজ আমার বাড়ীর সামনে দিয়ে যায়—মাড়োয়ারীর তেলকলের কেরাণী।

২

শ্মশানে একদিন দেখেছি তাকে। মড়া পোড়াতে গিয়েছিলাম, দেখি লোকটি দূরে দূরে অন্ধকারে ঘুরে বেড়াচ্ছে একা একা। আমাদের দেখে সরে' গেল।

৩

নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহর। 'লু' বইছে। পাশের যোগেন বাবুর বাড়ীর বাইরের ঘর থেকে নারী-কণ্ঠের চাপা

কান্না কানে এল। গিয়ে দেখি যোগেন বাবুর পায়ের উপর উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছে এক মলিনবসনা বধূ। রূপ নেই—স্বাস্থ্য নেই—অশ্রু ছাড়া আর কিছু নেই!

যোগেন বাবু দয়ালু লোক।

মেয়েটিকে পাঁচটি টাকা দিয়ে বললেন—আচ্ছা, শিবুকে আমি ধমকে দেব। রাতদুপুরে শ্মশানে যায় কেন!

শুনলাম শিবু সেই লোকটির নাম—সেই তেল-কলের কেরাণী।

৪

তন্ত্রের একটা বই হাতে এল।

পড়ে দেখলাম সাধনা করলে নাকি অদৃশ্যলোক থেকে ভামরী ঝামরী ডামরী নানা দেব দেবী ডাকিনী যোগিনী দেখা দেন অদৃশ্যলোকের অপরূপ ঐশ্বর্য্য নিয়ে। সিদ্ধ হয় সাধনার অনুরূপ। যে, যে কামনা নিয়ে সাধনা করে, সে, সেই সেই রূপে নাকি পায়। প্রিয়া-রূপেও নাকি পাওয়া যায়—যদি সাধনার জোর থাকে।

যদি জেরা করেন সদুত্তর দিতে পারব না।

মনে কিন্তু গল্প জাগে।

দিনের আলোয় দৃশ্যমান জগতে শিবু তেলকলের সামান্য কেরাণী, কুৎসিৎ হাড়পাঁজরা-বার-করা স্ত্রীর স্বামী, একপাল রুগ্ন ছেলেমেয়ের পিতা; অধিকাংশ লোকেই গ্রাহ্য করে না তাকে, গাল দেয় অনেকে। দিনের আলোয় সে নগন্য। শ্মশান-সাধনায় কিন্তু সে উত্তীর্ণ হয়েছে। রাতের অন্ধকারে তার কাছে অদৃশ্যলোক থেকে নেমে আসে পদ্মিনী, গলায় পরিয়ে দেয় বরমাল্য।

রাত দুপুরে

রাত দুপুরে ঘুম ভেঙে গেল হঠাৎ।

নিস্তব্ধ গভীর রাত্রি, খোলা জানালা দিয়ে জ্যোৎস্না-লোকিত নীল আকাশের খানিকটা দেখা যাচ্ছে, শুভ্র একখণ্ড লঘু মেঘ ছায়াপথের পাশ দিয়ে অলস মন্থর

গতিতে এগিয়ে চলেছে রেবতী নক্ষত্রের দিকে। ঝাউবনের মর্ম্মর ধ্বনি শোনা যাচ্ছে।

সহসা মনে হল—সে আসে নি। আসতে পারত কিন্তু আসে নি।

উঠে বসলাম বিছানায়। দূর চক্রবালরেখালগ্ন পর্ব্বত-শ্রেণী রহস্যময় হয়ে উঠেছে স্বপ্নপুরীর মোহ-মহিমায়—অব্যক্তের ইঙ্গিত যেন উঁকি দিচ্ছে দৃষ্টি সীমানার ওপার থেকে।

ধীরে ধীরে বাতায়নের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। এ কি!

দিনের বেলা যে তালগাছ দুটোকে প্রান্তরের দুই প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি—তারা কাছাকাছি সরে এসেছে—একজন আর একজনের কানে কি যেন বলছে চুপি চুপি।

সহসা তারা যেন টের পেয়ে গেল আমি দেখছি। সঙ্গে সঙ্গে সরে গেল তারা প্রান্তরের দুই প্রান্তে, দুষ্টু ছেলের মতো। ডেকে উঠল একটা নাম-না-জানা পাখী—যেন হেসে উঠল। আমি দাঁড়িয়ে রইলাম চুপ করে।

অবর্ত্তমান

সমস্তটা দিন বন্দুক কাঁধে ক'রে একটা চখার পিছনে ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। যাঁরা কখনও এ কার্য্য করেননি তাঁরা বুঝতে পারবেন না হয়তো যে, ব্যাপারটা ঠিক কি জাতীয়। ধূ ধূ করছে বিরাট বালির চর, মাঝে মাঝে ঝাউ গাছের ঝোপ, একধার দিয়ে শীতের শীর্ণ-গঙ্গা বইছে। চারিদিকে জনমানবের চিহ্ন নেই। হু হু করে তীক্ষ্ণ হাওয়া বইছে একটা। কহলগাঁয়ের খেয়াঘাটে গঙ্গা পেরিয়ে প্রায় ক্রোশ দুই বালির চড়া ভেঙে আমি এই পারিপার্শ্বিকের মধ্যে এসে উপস্থিত হয়েছিলাম সকালবেলা। সমস্ত দিন বন্দুক কাঁধে ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছি। বালির চড়া ভেঙে ভেঙে কতখানি যে হেঁটেছি, খেয়াঘাট থেকে কতদূরেই বা চলে এসেছি তা খেয়াল ছিল না। তবে মনে হচ্ছিল সারাজীবন ধ'রে যেন হাঁটছিই, অবিশ্রান্ত হেঁটে চলেছি, চতুর চখাটা কিছুতেই আমার বন্দুকের মধ্যে আসছে না, ক্রমাগত এড়িয়ে এড়িয়ে উড়ে পালাচ্ছে।

আমি এ অঞ্চলে আগন্তুক। এসেছি ছুটিতে বন্ধুর

বাড়ীতে বেড়াতে। আমি নেশাখোর লোক। একটি আধটি নয়, তিনটি নেশা আছে আমার। ভ্রমণ, সঙ্গীত এবং শিকার। এখানে এসে যেই শুনলাম খেয়াঘাট পেরিয়ে কিছুদূর গেলেই গঙ্গায় পাখী [illegible] যাবে, লোভ সামলাতে পারলাম না, বন্দূক কাঁধে ক'রে বেরিয়ে পড়লাম। লোভ শুনে মনে করবেন না যে আমি মাংস খাবার লোভেই পাখী মারতে বেরিয়েছি। তা নয়। আমি নিরামিষাশী। আলুভাতে ভাত পেলেই আমি সন্তুষ্ট।

খেয়াঘাট পেরিয়ে সকালে চরে এসে প্রথম যখন পৌঁছলাম তখন হতাশ হয়ে পড়তে হল আমাকে। কোথায় পাখী! ধূ ধূ করছে বালির চড়া আর কোথাও কিছু নেই। গঙ্গার বুকে দু একটা উড়ন্ত মাছরাঙা ছাড়া পাখী কোথায়! বন্দুক কাঁধে ক'রে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি এমন সময় কাঁআঁ শব্দটা কানে এল। কয়ে চন্দ্রবিন্দু আকার আর অয়ে চন্দ্রবিন্দু আকার দিয়ে যে শব্দটা হয় চখার শব্দটা ঠিক সে রকম নয় তবে অনেকটা কাছাকাছি বটে। কাঁআঁ শুনেই বুঝলুম চখা আছে কোথাও কাছে-পিঠে। একটু এগিয়ে গিয়ে দেখি, হ্যাঁ ঠিক, চখাই বটে—কিন্তু আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম মাত্র একটি দেখে।

চখারা সাধারণত জোড়ায় জোড়ায় থাকে। বুঝলাম দম্পতীর একটিকে কোন শিকারী আগেই শেষ করে গেছেন। এটির ভব-যন্ত্রণা আমাকেই ঘোচাতে হবে। সাবধানে এগুতে লাগলাম।

কাঁআঁ—

চখা উড়ে গেল। উড়বে জানতাম। চখা মারা সহজ নয়। দাঁড়িয়ে রইলাম খানিকক্ষণ। বেশ খানিক-ক্ষণ ঘুরপাক খেয়ে আরও খানিকটা দূরে গিয়ে বসল। বেশ খানিকটা দূরে। আমি আবার সাবধানে এগুতে লাগলাম। কাছাকাছি এসেছি, বন্দুকটি বাগিয়ে বসতে যাব আর অমনি কাঁআঁ—

উড়ে গেল। বিরক্ত হলে চলবে না, চখা শিকার করতে হলে ধৈর্য্য চাই। এবার চখাটা একটু কাছেই বসল। আমিও বসলাম। উপর্য্যুপরি তাড়া করা ঠিক নয়—একটু বসুক। একটু পরেই উঠলাম আবার। আবার ধীরে ধীরে এগুতে লাগলাম কিন্তু উল্টো দিকে। পাখীটা মনে করুক যে আমি তার আশা ছেড়ে দিয়েই চলে যাচ্ছি যেন। কিছুদূর গিয়ে ওধার দিয়ে ঘুরে তারপর বিপরীত দিক দিয়ে কাছে আসা যাবে। বেশ কিছু দূর ঘুরতে হল—প্রায় মাইল খানেক। গুঁড়ি মেরে মেরে খুব

কাছেও এসে পড়লাম। কিন্তু তাগ্ করে ঘোড়াটি যেই টিপতে যাব আর অমনি—

কাঁআঁ—

ফের উড়ল। উড়তেই লাগল অনেকক্ষণ ধরে। কিছুতেই আর বসে না। অনেকক্ষণ পরে বসল যদি কিন্তু এমন একটা বেখাপ্পা জায়গায় বসল যে সেখানে যাওয়া মুশকিল। যাওয়া যায়, কিন্তু গেলেই দেখতে পাবে। আমার কেমন রোক চড়ে গেল, মারতেই হবে পাখীটাকে! সোজা এগিয়ে চললাম। আমি ভেবেছিলাম একটু এগুলেই উড়বে, কিন্তু উড়ল না। যতক্ষণ না কাছাকাছি হলাম, ঠায় বসে রইল। মনে হল অসম্ভব বুঝি সম্ভব হয়; কিন্তু যে-ই বন্দুকটি তুলেছি আর অমনি—কাঁআঁ।

এবারেও এমন জায়গায় বসল যার কাছে-পিঠে কোন আড়াল আব্ডাল নেই—চতুর্দ্দিকেই ফাঁকা। কিছুতেই বন্দুকের নাগালের মধ্যে পাওয়া যাবে না। বাধ্য হয়ে সোজা এগিয়ে গিয়ে উড়িয়ে দিতে হল। এবার গিয়ে বেশ ভাল জায়গায় বসল। একটা ঝাউবনের আড়ালে আড়ালে গিয়ে খুব কাছাকাছিও আসতে পারলাম—এত কাছাকাছি যে তার পালকগুলো পর্য্যন্ত দেখা যেতে লাগল—ফায়ার করলাম।

কাঁআঁ—কাঁআঁ—

লাগল না। ঝোপে ঝাপে যা' দু'একটা ছোট পাখী ছিল তারাও উড়ল, মাছরাঙাগুলোও চেঁচাতে শুরু ক'রে দিলে। সমস্ত ব্যাপারটা থিতুতে আধঘণ্টারও ওপর লাগল। নদীর ঠিক বাঁকের মুখটাতেই বসল আবার চখাটা গিয়ে।

—আমি বসেছিলুম একটা বালির টিপির উপর, মুশকিল হল—উঠে দাঁড়ালেই দেখতে পাবে। উঠলাম না। শুয়ে পড়ে গিরগিটির মতো বুকে হেঁটে হেঁটে এগুতে লাগলাম। কিন্তু কিছুদূর গেছি, আর অমনি কাঁআঁ—

আমার মাথাটাই দেখা গেল, না, বালির স্তর দিয়ে কোন রকম স্পন্দনই গিয়ে পৌঁছল তার কাছে তা বলতে পারিনা। উঠে দাঁড়ালাম। রোক আরও চড়ল।

হঠাৎ নজরে পড়ল সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে। নদীর জল রক্ত-রাঙা। পাখীটা ওপারের চরে গিয়ে বসেছে। সমস্ত দিন আমিও ওকে বিশ্রাম দিইনি—ও-ও আমাকে দেয়নি। এখন দুজনে দুপারে। চুপ করে বসে রইলাম।

সূর্য্য ডুবে গেল। অস্তমান সূর্য্য-কিরণে গঙ্গার জলটা যত জ্বলন্ত লাল দেখাচ্ছিল সূর্য্য ডুবে যাওয়াতে ততটা আর রইল না। আসন্ন সন্ধ্যার অন্ধকারে স্নিগ্ধ হয়ে উঠল চতুর্দ্দিক। সমস্ত অন্তরেও কেমন যেন একটা বিষণ্ণ বৈরাগ্য জেগে উঠতে লাগল ধীরে ধীরে। পূরবী রাগিণী যেন মূর্ত্ত হয়ে উঠল আকাশে, বাতাসে, নদীতরঙ্গে। হঠাৎ মনে পড়ল—বাড়ী ফিরতে হবে।

কত রাত হয়েছে জানিনা।

ঘুরে বেরাচ্ছি গঙ্গার চরে চরে। রাস্তা হারিয়ে ফেলেছি। মধ্য গগনে পূর্ণিমার চাঁদ—চতুর্দ্দিক জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে। অনেকক্ষণ ঘুরে ঘুরে শেষে বসলাম একটা উঁচু জায়গা দেখে। অনেকক্ষণ চুপ করে' বসেই রইলাম। এমন একা জীবনে আর কখনও পড়িনি। প্রথম প্রথম একটু ভয় করছিল যদিও, কিন্তু খানিকক্ষণ পরে ভয়ের বদলে মোহ এসে আমার সমস্ত প্রাণ মন সত্তা অধিকার করে বসল। আমি মুগ্ধ হয়ে বসে রইলাম। মুগ্ধ হয়ে প্রকৃতির অনাবিল সৌন্দর্য্য দেখতে লাগলাম।

মনে হল কত জায়গায় কতভাবে ঘুরেছি, প্রকৃতির এমন রূপ তো আর কখনও চোখে পড়েনি। রূপ নিশ্চয়ই ছিল, আমার চোখে পড়েনি। নিজেকে কেমন যেন বঞ্চিত মনে হতে লাগল। তারপর সহসা মনে হ'ল আজীবন সব দিক দিয়েই আমি বঞ্চিত। জীবনের কোনও সাধটাই কি পুরোপুরি পূর্ণ হয়েছে? জীবনের তিনটি সখ ছিল—ভ্রমণ, সঙ্গীত, শিকার। ভ্রমণ করেছি বটে—ট্রেণে স্টীমারে চেপে এখানে ওখানে গেছি, কিন্তু তাকে কি ভ্রমণ বলে? হিমালয়ের উচ্চ চূড়ায়, সাহারার দিগন্ত প্রসারিত অনিশ্চয়তায়, ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সমুদ্রের তরঙ্গে তরঙ্গে, হিমশীতল মেরুপ্রদেশের ভাসমান তুষার-পর্ব্বতশৃঙ্গে যদি না ভ্রমণ করতে পারলাম তাহলে আর কি হল! সঙ্গীতেও ব্যর্থকাম হয়েছি। সা রে গা মা সেখেছি বটে; কিন্তু সঙ্গীতের আসল রূপটি আলেয়ার মতো চিরকাল এড়িয়ে এড়িয়ে গেছে আমাকে। সেদিন অত চেষ্টা করেও বাগেশ্রীর করুণগম্ভীর রূপটি কিছুতেই ফুটিয়ে তুলতে পারলাম না সেতারে।

ঠিক ঘাটে ঠিক ভাবেই আঙুল পড়ছিল; কিন্তু সেই সুরটি ফুটল না যাতে আত্মসম্মানী গম্ভীর ব্যক্তির নির্জ্জন-রোদনের অবাঙ্‌ময় বেদনা মূর্ত্ত হয়। শিকারই

বা কি এমন করেছি জীবনে? সিংহ হাতী বাঘ গণ্ডার কিছুই মারিনি। মেরেছি পাখী আর হরিণ। আজ তো সামান্য একটা চখার কাছেই হার মানতে হল।

কাঁআঁ—কাঁআঁ—কাঁআঁ—

চমকে উঠলাম। ঠিক মাথার উপরে চখাটা চক্রাকারে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পাখীরা সাধারণতঃ রাত্রে তো ওড়ে না—হয়তো ভয় পেয়েছে কোনরকমে। উৎসুক হয়ে চেয়ে রইলাম।

কাঁআঁ—কাঁআ—

আরও খানিকটা নেবে এল।

হঠাৎ বন্দুকটা তুলে ফায়ার ক'রে দিলাম।

কাঁআঁ—কাঁআঁ—কাঁআঁ—কাঁআঁ—

লেগেছে ঠিক। পাখীটা ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে পড়ল মাঝগঙ্গায়। উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়ালাম—দেখলাম ভেসে যাচ্ছে।

—যাক্। জীবনে যা বরাবর হয়েছে এবারও তাই হল। পেয়েও পেলাম না। সত্যি, জীবনে কখনই কিছু পাইনি, নাগালের মধ্যে এসেও সব ফসকে গেছে।

চুপ করে বসে ছিলাম।

চতুর্দ্দিকে ধূ-ধূ করছে বালি, গঙ্গার কুলুধ্বনি অস্পষ্ট-ভাবে শোনা যাচ্ছে, জ্যোৎস্নায় ফিনিক ফুটছে। শিকার, চখা, বন্দুক, সমস্ত দিনের শ্রান্তি কোন কিছুই কথাই মনে হচ্ছিল না তখন, একটা নীরব সুরের সাগরে ধীরে ধীরে ভেসে চলেছিলাম। হঠাৎ চমকে উঠলাম। দীর্ঘকায় ঋজু দেহ এক ব্যক্তি নদী থেকে উঠে ঠিক আমার সামনে দাঁড়িয়ে সংস্কৃতে মন্ত্রোচ্চারণ করতে করতে গামছা দিয়ে গা মুছতে লাগলেন। অবাক হয়ে গেলাম। কোথা থেকে এলেন ইনি, কখন বা নদীতে নাবলেন, কিছুই দেখতে পাইনি।

একটু ইতস্ততের পর জিজ্ঞাসা করলাম—"আপনি কে ?"

লোকটি এতক্ষণ আমাকে লক্ষ্যই করেননি।

আমার কথায় মন্ত্রোচ্চারণ থেমে গেল ; ফিরে আমার দিকে চেয়ে রইলেন ক্ষণকাল—তারপর বললেন—"আমি এখানেই থাকি। আপনিই আগন্তুক, আপনিই পরিচয় দিন।"

পরিচয় দিলাম।

"ও, রাস্তা হারিয়ে ফেলেছেন আপনি? আসুন আমার সঙ্গে, কাছেই আমার আস্তানা।"

দীর্ঘকায় ঋজুদেহ পুরুষটি অগ্রগামী হলেন, আমি তাঁর অনুসরণ করলাম। একটু দূর গিয়েই দেখি একটি ছোট্ট কুটির। আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম, সমস্ত দিন এ অঞ্চলে ঘুরে বেড়িয়েছি, এটা চোখে পড়েনি আমার। ছোট্ট কুটীরটি যেন ছবির মতন—সামনে পরিচ্ছন্ন প্রাঙ্গণ—চতুর্দ্দিকে রজনীগন্ধার গাছ—অজস্র ফুল। অনাবিল জোৎস্নায় ধরণীর অন্তরের আনন্দ সহসা যেন পুষ্পায়িত হয়ে উঠেছে গুচ্ছ গুচ্ছ রজনীগন্ধার উর্দ্ধমুখী বিকাশে। মৃদু সৌরভে চতুর্দ্দিক আছন্ন। আমিও আচ্ছন্ন হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। তিনি এসেই ঘরের ভিতরে ঢুকেছিলেন। একটু পরেই বেরিয়ে এলেন এবং শতরঞ্জি গোছের কি একটা পাততে লাগলেন।

"বসুন।"

বসে দেখলাম শতরঞ্জি নয়—গালিচা। খুব দামী নরম গালিচা। তিনিও একপ্রান্তে এসে বসলেন। বলা বাহুল্য আমার কৌতুহল ক্রমশঃই বাড়ছিল। তবু কিছুক্ষণ চুপ করে' রইলাম, তিনিও চুপ করে রইলেন। শেষে আমাকেই কথা কইতে হল।

"সমস্তদিন এ অঞ্চলে ঘুরেছি কিন্তু আপনার দেখা পাইনি কেন-ভেবে আশ্চর্য্য লাগছে।"

"সব সময় সব জিনিষ কি দেখা যায়?"

মুখের দিকে চেয়ে ভয় হল—চোখ দুটো জ্বলছে—মানুষের নয়, যেন বাঘের চোখ।

"একটা গল্প শুনুন তাহলে। রাজা রামপ্রতাপ রায়ের নাম শুনছেন?"

"না।"

"শোনবার কথাও নয়। দুজন রামপ্রতাপ ছিল—দুজনেই জমিদার—একজন সুদ-খোর আর একজন সুর-খোর।"

"সুরখোর?"

"হ্যাঁ—ও রকম সুর-পাগল লোক ও অঞ্চলে আর ছিল না। যত বিখ্যাত ওস্তাদের আড্ডা ছিল তাঁর বাড়ীতে। আমার অবশ্য এসব শোনা কথা। আমার পাঞ্জাবে জন্ম, পাঞ্জাবী ওস্তাদের কাছেই গান বাজনা শিখেছিলুম। বাংলাদেশে এসে শুনলুম, রামপ্রতাপ নামে নাকি একজন গুণী জমিদার আছেন যিনি সুরের প্রকৃত সমঝদার। প্রকৃত গুণীকে কখনও ব্যর্থমনোরথ হতে হয়নি তাঁর কাছে—গাড়ীতে একজনের মুখে কথায়

কথায় শুনলুম। তখনই যদি তাঁকে ঠিকানাটাও জিগ্যেস করি তাহলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যায়—কিন্তু তা না করে আমি সপ্তাহখানেক পরে আর একজনকে জিগ্যেস করলুম—রাজা রামপ্রতাপ রায় কোথায় থাকেন। তিনি বলে দিলেন সুদ-খোর রামপ্রতাপের ঠিকানা। ডানকুনি ষ্টেশনে নেবে দশ ক্রোশ হাঁটলে তবে নাকি তাঁর নাগাল পাওয়া যাবে। একদিন বেরিয়ে পড়লাম তাঁর উদ্দেশ্যে। ডানকুনি ষ্টেশনে যখন নাবলাম তখন বেশ রাত হয়েছে। সেদিনও পূর্ণিমা। ষ্টেশনে নেবে আর একজনকে জিগ্যেস করলাম। সুদ-খোর রাম-প্রতাপ ও অঞ্চলে প্রসিদ্ধ লোক, সবাই চেনে। যাকে জিগ্যেস করলুম সে একটা রাস্তা দেখিয়ে দিয়ে বললে সোজা চলে যান। চলতে লাগলাম। কতক্ষণ চলে-ছিলাম তা ঠিক বলতে পারিনা। খানিকক্ষণ পরে দেখলাম একটা বিরাট প্রান্তরের মাঝখান দিয়ে হাঁটছি —চারদিকে কেবল মাঠ আর মাঠ—আর কোথাও কিচ্ছু নেই। মনে হল যেন শেষও নেই।

"কিছুদূরে গিয়েই হঠাৎ সামনে প্রকাণ্ড রাজবাড়ীটা দেখা গেল, যেন মন্ত্রবলে আবির্ভূত হল—সাদা ধবধব করছে, মনে হল যেন মর্ম্মর পাথর দিয়ে তৈরী। মিনার,

মিনারেট, গম্বুজ, সিংহদ্বার সমস্ত দেখা গেল ক্রমশঃ। অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম খানিকক্ষণ—তারপর এগিয়ে গেলাম। প্রকাণ্ড সিংহদ্বারের তুপাশে দেখি তুজন বিরাটকায় দারোয়ান বসে আছে—তু'জনেই নিবিষ্টচিত্তে গোঁফ পাকাচ্ছে বসে। ভিতরে ঢুকব কিনা জিজ্ঞাসা করলাম, কেউ কোন উত্তরই দিলে না, গোঁফই পাকাতে লাগল। একটু ইতস্ততঃ ক'রে শেষে ঢুকে পড়লাম, তারা বাধা দিলে না। ভিতরে ঢুকে দেখি—বিরাট ব্যাপার, বিশাল জমিদারবাড়ী জমজম্ করছে; প্রকাণ্ড কাছারি বাড়ীতে বসে' আছে সারি সারি গোমোস্তারা। কেউ লিখছে, কেউ টাকা গুণছে, কেউ কেউ কানে কলম গুঁজে খাতার দিকে চেয়ে আছে—সবারই গম্ভীর মুখ। সামনে চত্বরে বসে আছে অসংখ্য প্রজা সারি সারি। সবাই কিন্তু চুপচাপ, কারো মুখে টুঁ শব্দটি নেই। আমি তানপুরা ঘাড়ে করে' এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতে লাগলাম, কেউ আমার দিকে ফিরেও চাইলে না, আমারও সাহস হ'লনা কাউকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করতে, আমি ঘুরেই বেড়াতে লাগলাম। আমার মনের ইচ্ছে রাজা রামপ্রতাপকে গান শোনাব, কিন্তু—হঠাৎ দেখতে পেলাম কিছুদূরে ছোট্ট

একটা বাগান রয়েছে—বাগানের মধ্যে ধবধবে সাদা মার্ব্বেল পাথরের উঁচু চৌতারা আর সেই চৌতারার উপরে কে একজন ধবধবে সাদা তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে প্রকাণ্ড একটা গড়গড়ায় তামাক খাচ্চেন। গড়গড়ার কুণ্ডলী-পাকানো নলের জরিগুলো জ্যোৎস্নায় চক্‌মক্ করছে। বাগানে ছোট্ট একটি গেট, গেটের দুধারে উর্দ্দি-চাপরাশ-পরা দুজন দারোয়ান দাঁড়িয়ে আছে—ঠিক যেন পাথরের প্রতিমূর্ত্তি। কেমন করে' জানিনা, আমার দৃঢ় ধারণা হল ইনিই রাজা রামপ্রতাপ। এগিয়ে গেলাম। দারোয়ান দুজন নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, বাধা দিলেনা। রাজা রামপ্রতাপের কাছাকাছি এসে ঝুঁকে প্রণাম করলাম একবার।

"তিনি গম্ভীরভাবে মাথাটি নাড়লেন একবার শুধু। আস্তে আস্তে বললাম—হুজুরকে গান শোনাব বলে এসেছি, যদি হুকুম করেন—

"তিনি সোজা হয়ে উঠে বসলেন, হাতের ইঙ্গিতে আমাকেও বসতে বললেন। তারপর কখন যে আমি দরবারি কানাড়ার আলাপ শুরু করেছি আর কতক্ষণ ধরে' যে সে আলাপ চলেছে তা আমার কিছুই মনে নেই। যখন হুঁস হ'ল তখন দেখি, এক ছড়া মুক্তোর মালা তিনি

আমার গলায় পরিয়ে দিচ্ছেন। মালাটা দেখবেন?" কুটিরের ভিতর ঢুকে গেলেন তিনি, পরমুহূর্ত্তেই বেরিয়ে এলেন এক ছড়া ক্তোর মালা নিয়ে। অমন সুন্দর এবং অত বড় বড় মুক্তো আমি আর দেখিনি কখনও।

"তারপর?"

"আমাকে মালা পরিয়ে দিয়ে তিনি আস্তে আস্তে উঠে গেলেন। আমি চুপ ক'রে বসেই রইলাম। তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছি, কিছু মনে নেই। সকালে যখন ঘুম ভাঙল তখন দেখি রাজবাড়ী, কাছারি, চৌতারা লোকজন—কোথাও কিচ্ছু নেই—ফাঁকা মাঠের মাঝখানে আমি একা শুয়ে ঘুমুচ্ছি।'

"একা? কি রকম?"—সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলাম।

"হ্যাঁ। ফাঁকা মাঠের মাঝখানে একা—কেউ নেই। পরে খোঁজ নিয়ে জানলাম, গুণী রাজা রামপ্রতাপ অনেকদিন হল মারা গেছেন। বেঁচে আছে সেই সুদখোর ব্যাটা। তার বাড়ীর পথই সবাই আমাকে বলে দিয়েছিল। কিন্তু আমার মনের একান্ত ইচ্ছে ছিল গুণী রামপ্রতাপকে গান শোনাবার, তাই তিনি মাঠের মাঝখানে আমাকে দেখা দিয়ে আমার গান শুনে বখ্শিষ দিয়ে গেলেন।"

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপ ক'রে রইলাম। কতক্ষণ তা মনে নেই। হঠাৎ তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—"গান শুনবেন ?"

"যদি আপনার অসুবিধে না হয়—"

"অসুবিধে আবার কি। সুরের সাধনা করবার জন্যেই আমি এই নির্জ্জনবাস করছি—"

আবার উঠে গেলেন। কুটিরের ভিতর থেকে বিরাট এক তানপুরা বার করে বললেন—"বাগেশ্রী আলাপ করি শুনুন।"

শুরু হয়ে গেল বাগেশ্রী। ওরকম বাগেশ্রীর আলাপ আমি কখনও শুনিনি। যা নিজে আমি কখনও আয়ত্ত করতে পারিনি কিন্তু আয়ত্ত করতে চেয়েছিলাম তাই যেন শুনলাম আজ। কতক্ষণ শুনেছিলাম মনে নেই, কখন ঘুমিয়ে প'ড়েছিলাম তা-ও জানিনা, ঘুম ভাঙল যখন, তখন দেখি আমি সেই ধু ধূ বালির চড়ায় একা শুয়ে আছি, কোথাও কেউ নেই। উঠে বসলাম। উঠতেই নজরে পড়ল চখাটা চরে' বেড়াচ্ছে, মরেনি।

আমরা তিনজনেই সবিস্ময়ে ভদ্রলোকের গল্পটা রুদ্ধশ্বাসে শুনিতে ছিলাম। শিকার উপলক্ষ্যেই আমরা

এ অঞ্চলে আসিয়া সন্ধ্যাবেলা এই ডাকবাংলায় আশ্রয় লইয়াছি। পাশের ঘরেই ভদ্রলোক ছিলেন। আলাপ হইলে আমরা শিকারী শুনিয়া তিনি নিজের এই অদ্ভুত অভিজ্ঞতার গল্পটি আমাদের বলিলেন। অদ্ভুত অভিজ্ঞতাই বটে। জিজ্ঞাসা করিলাম—"তারপর ?"

"তারপর আর কিছু নেই। রাত হয়েছে, এবার শুতে যান, আপনাদের তো আবার খুব ভোরেই উঠতে হবে। আমারও ঘুম পাচ্ছে—"

এই বলিয়া তিনি আস্তে আস্তে উঠিয়া নিজের ঘরে প্রবেশ করিলেন। আমরা কিছুক্ষণ প করিয়া বসিয়া রহিলাম। তাহার পর হঠাৎ আমার কৌতূহল হইল কোন্ অঞ্চলের গঙ্গার চরে এই কাণ্ড ঘটিয়াছিল জানিতে পারিলে আমরাও একবার জায়গাটা দেখিয়া আসিতাম। জিজ্ঞাসা করিবার জন্য পাশের ঘরে ঢুকিয়া দেখি, ঘরে কেহ নাই। চতুর্দ্দিকে দেখিলাম—কেহ নাই।

ডাকবাংলার চাপরাশিকে জাগাইয়া প্রশ্ন করিলাম, পাশের ঘরে যে ভদ্রলোক ছিলেন তিনি কোথাকার লোক। চাপরাশি উত্তর দিল, পাশের ঘরে তো কোন লোক নাই, গত দুই সপ্তাহের মধ্যে এখানে আর কেহ আসে নাই। এ ডাকবাংলায় কেহ বড়

একটা আসিতে চায়না—বলিয়া সে অদ্ভুত একটা হাসি হাসিল।

শেষ-কিস্তি

সেই সবে ডাক্তারি পাশ করেছি। চিকিৎসা-শাস্ত্রে এবং নিজের নৈপুণ্যে তখন অগাধ বিশ্বাস। রোগী একটা পেলেই হয়। সাজ সজ্জা করে' রাস্তার ধারে একটা ঘর ভাড়া নিয়ে উন্মুখ হয়ে বসে থাকি। বুড়ো দীনু ডাক্তারেরই যত 'কল'—অথচ লোকটা যতদূর সেকেলে হতে হয়—অতি-আধুনিক আবিষ্কারের ধার ধারেন না কোন। নাড়ী টিপে, জিব দেখে, পেট টিপে, অত্যন্ত অনাড়ম্বর পদ্ধতিতেই বেশ চালিয়ে যাচ্ছেন, অথচ আমরা—যাক্ সে কথা। ওই দীনু ডাক্তারই আমাকে ডাকলেন একদিন তাঁর একটা 'কেসে'। সে 'কেসে' দুজন নামজাদা ডাক্তার এসেছিলেন। আমাকে ডাকা হয়েছিল রাত জাগবার জন্যে। রোগীর কাছে সর্ব্বদা একজন কৃতবিদ্য ডাক্তারের প্রয়োজন অনুভব করছিলেন সবাই। রাত্রির ভারটা আমার উপর দিয়েছিলেন

দীনুবাবু। সম্ভবত আমার দাদামশায়ের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব ছিল বলে'।

গিয়ে দেখি হৈ হৈ ব্যাপার রৈ রৈ কাণ্ড। আশপাশের যত নামকরা ডাক্তার সবাই সমবেত হয়েছেন। কোলকাতা থেকে শুধু দু'জন ডাক্তারই নয়, নার্সও এসেছেন। আমিও গিয়ে হাজির হলাম। অথচ ছেলেটির হয়েছে ম্যালেরিয়া—ম্যালিগ্‌নান্ট টাইপের অবশ্য—কিন্তু তবু ম্যালেরিয়ার জন্যে এত ধুমধাম কেন বুঝলাম না। গ্রেন কয়েক কুইনিন দিলেই তো চুকে যেত।

সাড়ম্বরে অতি-আধুনিক পদ্ধতিতে চিকিৎসা এবং শুশ্রূষার ব্যবস্থা করে' মোটা মোটা ফি নিয়ে বড় বড় ডাক্তাররা বিদায় নিলেন। ঠিক হল একজন নার্স শয্যা-পার্শ্বে মোতায়েন থাকবেন, আমি থাকব পাশের ঘরে, দরকার বুঝলে আমাকে ডাকা হবে, তাছাড়া দুঘণ্টা অন্তর নাড়ীও পরীক্ষা করতে হবে ঘড়ি ধরে'—শ্বাস প্রশ্বাসও গুনতে হবে। যাবার আগে দীনু ডাক্তার বলে গেলেন—"তুমি এখানে আসবার আগে, আমার সঙ্গে দেখা কোরো একবার—"

"আচ্ছা।"

রাত্রে সকাল সকাল খাওয়া দাওয়া সেরে নানারকম

ইনজেক্‌সনের সরঞ্জাম ব্যাগে পুরে বেরিয়ে পড়লাম। দীনু ডাক্তার বাইরের ঘরে একা বসে গড়গড়ায় তামাক খাচ্ছিলেন।

"এস, ব'স। একটা কথা বলবার জন্য তোমাকে ডেকেছি। পাল্‌স রেস্‌পিরেশন গোনা ছাড়া আর যেন কিছু করতে যেও না তুমি। কোন ইন্‌জেক্‌শন ফিন্‌-জেক্‌শন দিও না যেন—"

"পাল্‌স্‌টা যদি খারাপ হয়, একটা ষ্ট্রিক্‌নিন্‌ বা ক্যামফার ইন্‌ ইথার দিলে ক্ষতি কি—"

"কিছু ক'রো না—বদনাম হয়ে যাবে—"

মিনিট খানেক গড়গড়া টেনে বললেন—"ও ছেলে বাঁচবে না—"

"ম্যালেরিয়া হয়েছে, কুইনিন পড়ে গেছে, না বাঁচবার কোন কারণ দেখছি না তো—"

"কিছুতেই বাঁচবে না। এর আগে ছ'টা মরেছে। ওর ছেলে বাঁচে না।—"

"ছ'টা মরেছে!"

"হ্যাঁ। এক একটা ছেলে জন্মায়, সাত আট বছর বেঁচে থাকে, তারপর একটা কিছু হয় আর পট্‌ করে' মরে যায়। কোনবারই চিকিৎসার ত্রুটি হয় নি।

মরে যাবার বছর খানেক পরেই আবার একটা ছেলে জন্মায়—বছর কয়েক বাঁচে—তারপর অসুখ হয় আর মরে' যায়। আমার হাতেই ছ'জন গেছে—এটাও যাবে। খরচ করাতে আসে খালি—"

বৃদ্ধ গম্ভীর মুখে তামাক টানতে লাগলেন।

আমার মনে হল বুড়োর বোধহয় ভীমরতি হয়েছে। ছ'জন মরেছে বলে সপ্তমকেও যে মরতে হবে—একি একটা বৈজ্ঞানিক যুক্তি হ'ল। আর কিছু যদি নাই করতে হয়, তাহ'লে শুধু শুধু আমাকে একশ' টাকা দেবার মানে কি? আমার মনে যাই হোক বাইরে চুপ করে রইলাম। বুড়োর সঙ্গে তর্ক করে লাভ কি।

২

গভীর রাত্রে নার্স এসে ডাকলে।

গিয়ে দেখি খোকার বাবা—এ অঞ্চলের বিখ্যাত ধনী বৃদ্ধ জগৎ সেন—বিছানার একধারে চুপ করে বসে আছেন। তাঁর দিকে কটমট্ করে' চেয়ে খোকা বলে চলেছে—"ডাক্তারের একশ' টাকা আর নার্সের

পঞ্চাশ টাকা দিয়ে দাওনা, আমি চলে যাই। কেন আর আটকে রেখেছ আমাকে, দিয়ে দাও শিগ্‌গির আমি আর থাকতে পারছি না—শিগ্‌গির দিয়ে দাও—শিগ্‌গির দিয়ে দাও—"

বিছানা ছেড়ে ঠেলে উঠতে চেষ্টা করতে লাগল। দু'জনে মিলে চেপে ধরতে হ'ল তাকে।

"শিগ্‌গির দাও—শিগ্‌গির দিয়ে দাও—"

যেন আট বছরের ছেলের কণ্ঠস্বর নয়—একজন প্রবীন বুড়ো যেন খন খন করে' কথা বলছে! এ অবস্থায় হায়োসিন হাইড্রোবোম্ দেওয়া উচিত না মরফিন্ দেওয়া উচিত ভাবছি—এমন-সময় জগৎ বাবু এক কাণ্ড করে বসলেন। হঠাৎ তিনি মাটিতে হাঁটু গেড়ে করজোড়ে বলে উঠলেন—"নবীন বাবু দয়া করুন আমাকে—আমি সুদ-সমেত পাই পয়সা সব শোধ করে দিচ্ছি—আপনি যাবেন না, থাকুন, দয়া করুন আমাকে—"

"না, জোচ্চরের বাড়ী আমি থাকি না—"

"ওরে খোকা, বাবা আমার—"

আর্ত্তকণ্ঠে কেঁদে উঠলেন জগৎ বাবু।

খোকা আবার ঠেলে উঠতে চেষ্টা করতে লাগল।

"শিগগির ফিস দিয়ে দাও এঁদের—"

"দিচ্ছি দিচ্ছি—"

আলু থালু বেশে উঠে পড়লেন জগৎ বাবু। তাড়াতাড়ি 'সেফ' খুলে টাকা বার করে' আমাকে আর নার্সকে দিলেন।

খোকা যেন তৃপ্ত হয়ে চোখ বুজল।

সে চোখ আর খুলল না।

মালাবদল

গভীর রাত্রি। আকাশে জ্যোৎস্নার পাথার। একরাশি ছোট ছোট সাদা মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে একধারে। একরাশি শুভ্র চন্দ্রমল্লিকা যেন।

দ্বিতলের বাতায়নে বন্দনা চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে একা। আজ তার জীবনের পরম রাত্রি। স্বামীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হবে। ঠিক প্রথম নয়, তবু প্রথম। বাসর ঘরের ভীড়, ফুলশয্যার অস্বাভাবিকতা, সমাজের কলরব সমস্ত চুকে গেছে। আজই প্রথম প্রকৃত মিলন-রাত্রি।

…নিরালা জ্যোৎস্না-যামিনী নিবিড় হয়ে আসছে।

চোখ গেল—চোখ গেল—চোখ গেল—

ধাপে ধাপে সুর চড়িয়ে ডেকে উঠল পাখীটা। জ্যোৎস্নায় শিহরণ লাগল। খোঁপা থেকে বেলফুল পঁড়ে গেল একটা। ফুলটা হাসছে…।

আকাশের ছোট ছোট মেঘগুলি রূপান্তরিত হয়েছে। চন্দ্র মল্লিকার রাশি নেই, এক জোড়া রাজহাঁস ভেসে বেড়াচ্ছে পাশাপাশি। স্বপ্নলোক যেন।

স্বপ্নলোকই তো। বন্দনার স্বপ্ন সফল হয়েছে অমন রূপবান গুণবান স্বামী তাকেই পছন্দ করেছেন। বাংলা দেশে মেয়ের অভাব ছিল না। কত রূপসী কত বিদুষী, কত ধনীর দুলালী এসেছিল ভীড় করে'। কিন্তু তার সুরের কাছে পরাভব মানতে হয়েছিল সবাইকে।

…একটা সূক্ষ্ম গর্ব্ব গোলাপী নেশার মতো সঞ্চারিত হ'তে লাগল তার মনে। হবে না? মনে পড়ল কি কৃচ্ছ্রসাধনই না সে করেছে। সেতার, এস্রাজ, বীণ্। দিবারাত্রি গলা সাধা। তানপুরার সঙ্গে বড় বড় রাগ-রাগিণীর আলাপ। জীবনে আর তো কিছুই সে করেনি। গত ষোল বৎসর সুরের সাধনাই করেছে কেবল একাগ্রচিত্তে। সুরের ঝরণাতলায় দেখা হ'লো স্বামীর সঙ্গে। স্বামীর অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানি ফুটে

উঠতে লাগল মানস-পটে ধীরে ধীরে। আজ রাত্রে বাগেশ্রী আলাপ করে' শোনাবে সে। সেতারটা পাশের ঘরে এনে রেখেছে।

...ঝন্ করে শব্দ হ'ল একটা। সেতারের তারটা ছিঁড়ে গেল নাকি? ঘাড় ফিরিয়ে অবাক হয়ে গেল বন্দনা। পাশের ঘরের দরজায় একটি তন্বী রূপসী দাঁড়িয়ে আছে। অপরূপ রূপসী।

"আমি চললুম।"

"কে আপনি?"

"তোমার গানের সুর। এতদিন আমাকে নিয়ে তন্ময় হয়ে ছিলে তাই তোমার কাছে ছিলাম। এখন তুমি আর একজনের গলায় মালা দিয়ে তারই স্বপ্নে বিভোর হয়ে আছ। আমার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। আমি চললুম।"

বন্দনাকে কিছু বলবার অবকাশ না দিয়ে বেরিয়ে গেল। মিলিয়ে গেল যেন। বিস্ময়ে নির্ব্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল বন্দনা। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল।...

উন্মুক্ত বাতায়ন-পথে আকাশের দিকে চোখ পড়ল। সমিথুন নেই। স্বচ্ছ-বসনা একটি পরী উড়ে চলেছে

যেন অজানার উদ্দেশে। ওড়নাটা উড়ছে আকাশ জুড়ে···।

হঠাৎ সে চমকে উঠল। পিছনের দিক থেকে চোখ দুটো টিপে ধরছে কে। নিঃশব্দচরণে স্বামী এসে প্রবেশ করেছেন সে টের পায়নি।

দুই ভিক্ষুক

বারাণসীর জনবহুল পথের ধারে অন্ধ ভিখারীটি বসে থাকে। পোড়া পোড়া কালো চেহারা। যেন ঝলসানো। অল্প কয়েকদিন হ'ল এসেছে। কোথা থেকে এসেছে কেউ জানে না। এমন কি, অন্যান্য ভিখারীরাও তার সম্বন্ধে অজ্ঞ। প্রশ্ন করলে উত্তর দেয় না। রাস্তার একধারে ছেঁড়া কাপড়টি পেতে সসঙ্কোচে বসে থাকে শুধু। ভিক্ষাও চায় না। হাত পেতে বসে থাকে শুধু নীরবে। তবু ভিক্ষা মেলে। কাশীতে পুণ্যার্থীর ভীড়, পুণ্যসংগ্রহের জন্যেই লোকে আসে এখানে, ভিক্ষা দিতে কার্পণ্য করে না। নীরব ভিখারীটির ছেঁড়া কাপড়ও ভরে ওঠে রোজ নানাজনের

নানা দাক্ষিণ্যে। আধলা, পয়সা, ডবলপয়সা, আনি দুয়ানি, সিকি এমন কি আধুলিও পড়ে মাঝে মাঝে। গোটা টাকাও পড়েছিল একদিন একটা। খাবারও জমে নানারকম। ভিখারি কিন্তু বসে থাকে নীরবে। অন্ধ চোখের দৃষ্টি নির্ব্বিকার। গভীর রাত্রে রাস্তাঘাট নির্জ্জন হ'লে ধীরে ধীরে ওঠে। কাপড়ের উপর সঞ্চিত সমস্ত জিনিস পুঁটুলি করে' বেঁধে লাঠি ঠুক ঠুক করে' গঙ্গার ঘাটে যায়...তারপর গঙ্গাগর্ভে ফেলে দিয়ে আসে সব। সে যা চায় তা পায় নি। কাপড়টি বিছিয়ে আবার বসে এসে রাস্তার ধারে। কতদিন বসে থাকতে হবে কে জানে!

২

সেদিন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। পথ জনবিরল হয়ে এসেছে। আর-একটি ভিখারীর আবির্ভাব হ'ল সেই পথে। ন্যুব্জদেহ স্থবির। গায়ে ছেঁড়া কাঁথা, পায়ে ন্যাকড়া জড়ানো। মাথায় জট প'ড়ে গেছে। শীর্ণ কঙ্কালসার দেহ। এই ভিখারীটি এসে

প্রথম ভিখারীর কাছে দাঁড়াল এবং নিজের ভিক্ষার থলিটি তার কাপড়ে উজাড় করে' ঢেলে দিলে। ঢেলে দিয়ে দাঁড়াল না, চলে যাচ্ছিল, সহসা প্রথম ভিখারী পুলকিত হ'য়ে উঠল। দেখতে দেখতে অদ্ভুত রূপান্তর ঘটল তার। গায়ের রং টক্‌টকে ফরসা হ'য়ে গেল··· মাথার চুল সোনালি। চেহারাই বদলে গেছে একেবারে। উঠে দাঁড়িয়ে সে চীৎকার ক'রে উঠল—"আমায় ক্ষমা ক'রে যাও মহারাজ, চলে যেও না। আমি ক্ষমা চাইছি, হাত জোড় ক'রে ক্ষমা চাইছি—"

ন্যুব্জদেহ ভিখারী ঘুরে দাঁড়াল।

সাহেব বলতে লাগল—"ক্ষমা কর আমাকে মহারাজ। কতদিন যে তোমার আশায় বসে আছি! অভিশপ্ত-জীবন আর বইতে পারছি না। কত রৌরবে পুড়েছি, কুম্ভীপাকে ঘুরেছি। এখন আমার উপর আদেশ হয়েছে, ভারতবর্ষে ভিখারী-জীবন যাপন কর গিয়ে যদি কোনদিন তার হাতে ভিক্ষা পাও তবেই তোমার রূপান্তর ঘটবে। সে যদি তোমাকে ক্ষমা করে তাহ'লেই তোমার মুক্তি। আমায় ক্ষমা কর মহারাজ···"

ন্যুব্জদেহ ভিখারীর মুখও আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। যাক, এতদিনে দেখা পাওয়া গেছে তাহ'লে।

"মিষ্টার হেষ্টিংস? তোমাকে আমিও তো খুঁজছি জন্মজন্মান্তর ধরে'। তোমাকে যে আমি ক্ষমা করেছি তা তোমাকে না জানানো পর্য্যন্ত আমারও যে মুক্তি নেই!"

"ক্ষমা করেছ?"

"নিশ্চয়!"

দেখতে দেখতে ন্যুব্জদেহ স্থবির ভিখারী সৌম্যদর্শন ব্রাহ্মণে রূপান্তরিত হল।

ওয়ারেন হেষ্টিংস আর মহারাজ নন্দকুমার পরস্পরকে আলিঙ্গন করলেন।

প্রমাণ

ভদ্রলোক কোথা থেকে এসেছিলেন। কেউ জানত না। বাইরের কোন ভড়ং ছিল না। জটা, গেরুয়া, প্রাণায়াম, বক্তৃতা কিছু না। তিনি যে আধ্যাত্মিক মার্গের পথিক তা কেউ সন্দেহও হয়ত করত না যদি না তিনি শহর ছেড়ে গঙ্গার ধারের পোড়ো বাড়ীটাতে আশ্রয় নিতেন। প্রথম প্রথম লোকে অন্য রকমও ভেবেছিল। কেউ ভেবেছিল ফেরারি আসামী, কেউ ভেবেছিল গোয়েন্দা। উর্ব্বর মস্তিষ্কের অভাব নেই। নানাবিধ কল্পনা করেছিল লোকে। কিন্তু অনেকদিন কেটে যাবার পরও যখন চমকপ্রদ কিছু ঘটল না, তখন সবাই মানতে বাধ্য হল লোকটা ভালই সম্ভবত—সাধু-সন্ন্যাসী গোছ কিছু একটা হবে। কিন্তু লোকেদের এ ধারণাকেও তিনি প্রশ্রয় দেন নি। কেউ হাত দেখাতে এলে বলতেন—আমি কিছু জানি না। দেব ঔষধ চাইতে এলে বলতেন—জানি না। ভগবান সম্বন্ধে কিছু জানতে চাইলে বলতেন—জানি না। উদ্ধতভাবে বলতেন

না। অত্যন্ত সসঙ্কোচে মৃদুকণ্ঠে বলতেন। কৌতূহলী জনতা বারবার তাঁর কাছে গিয়ে হতাশ হয়ে নিরস্ত হয়েছিল শেষটা।

নিরস্ত হন নি কেবল হারাধন বাবু। তিনি ফাঁক পেলেই যেতেন। এই অনাড়ম্বর নির্জ্জনতাপ্রিয় নির্ঝঞ্ঝাট লোকটিকে বড় ভাল লাগত তাঁর। তাঁর কাছে গিয়ে চুপ করে' বসে থাকতেন। তাঁর কেবলই মনে হ'ত লোকটির মধ্যে ঐশ্বর্য্য আছে কোন। কি ঐশ্বর্য্য আছে জানবার চেষ্টা করেন নি কোন দিন। কাছে গিয়ে বসলেই সমস্ত অন্তর পরিপূর্ণ হয়ে উঠত। কথাবার্ত্তা অল্পই হ'ত। যা হ'ত তাও অতি সাধারণ। যুদ্ধের কথা, দুর্ভিক্ষের কথা—এই সব। ভগবদ্-প্রসঙ্গ একদিন উত্থাপন করেছিলেন হারাধন বাবু।

"আচ্ছা, ভগবানের সম্বন্ধে কি ধারণা আপনার—"

"কি বলব—"

একটু অপ্রস্তুত মুখে চুপ করে' রইলেন তিনি।

"আপনি কখনও কিছু দেখেন নি ?"

"আমি ? আপনি যা দেখছেন আমিও তাই দেখেছি। আকাশ-সমুদ্র-নদী-প্রান্তর-ফল-ফুল-সূর্য্য-চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্রময় বিরাট বিচিত্র চেতনা—এর বেশী আর তো কিছু দেখি না।"

"এই তাহ'লে ভগবান ?"

"কি জানি।"

সসঙ্কোচে চুপ করে' রইলেন।

কিছুক্ষণ বসে' থেকে হারাধন বাবু উঠে এলেন।

ফিরবার পথে নরেন বাবুর সঙ্গে দেখা হ'ল। নরেন বাবু বিদ্বান লোক।

"কোথা গেছলেন হারাধন বাবু ?"

"গঙ্গার ধারের সেই সাধুটির কাছে।"

"কে সাধু ? সেই পোড়ো বাড়ীটাতে থাকে যে লোকটা ?"

"হ্যাঁ।"

"সে সাধু কে বললে আপনাকে! আস্ত ইডিয়ট একটা। পাছে বিদ্যে ফাঁস হয়ে যায় বলে' পারতপক্ষে কথা বলে না। বোগাস্!"

হারাধন বাবু মৃদু হাসলেন একটু। নরেন বাবুর সঙ্গে তর্ক করবার সামর্থ্য নেই তাঁর।

নরেন বাবু আবার জিজ্ঞাসা করলেন— তার সাধুত্বের প্রমাণ পেয়েছেন কোন ?"

"না।"

"তবে ?"

হারাধনবাবু চুপ করেই রইলেন।

এই ভাবেই কাটছিল। হারাধন বাবু তবু সময় পেলেই যেতেন তাঁর কাছে। আর সকলের কৌতূহল ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, হারাধন বাবুরই হয় নি।

•

কিন্তু কিছুদিন পরে হারাধন বাবুও যাওয়া বন্ধ করলেন। অন্য কোন কারণে নয়, তাঁর একমাত্র ছেলেটির টাইফয়েড হয়েছিল বলে'। তারই চিকিৎসা ব্যাপারে এত ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল যে অন্য কোন দিকে মন দেবার অবসরই পান নি তিনি। ছেলের অসুখ উত্তরোত্তর বেড়ে উঠতে লাগল। চিকিৎসার কোন ত্রুটি করেন নি তিনি। সাধ্যের অতীত হলেও শহরের সমস্ত নামজাদা চিকিৎসকদের একত্রিত করে' তাদের পরামর্শ অনুযায়ী চলছিলেন। অসুখ কিন্তু বেড়েই চলল। দিন কাটে ত রাত কাটে না। একদিন বিকেলে ডাক্তারেরা জবাব দিয়ে গেলেন। আশা নেই, রাত কাটবে কিনা সন্দেহ। বাড়ীতে কান্নার রোল উঠল। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হারাধন পুত্রের মৃত্যুশয্যার শিয়রে বসে' চতুর্দ্দিকে অন্ধকার ছাড়া

আর কিছুই দেখতে পেলেন না। হঠাৎ সেই সাধুটির কথা মনে পড়ল। আস্তে আস্তে উঠে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

……রাত তখন অনেক হয়েছে। কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ মেঘের স্তর ভেদ করে' সবে উঠেছে। গঙ্গার জল কুলে। কুলে ভরা। হাওয়া উঠেছে একটা। কল-কল ধ্বনিতে গঙ্গাতীর মুখরিত। হন্তদন্ত হারাধন পোড়ো বাড়ীটাতে এসে হাজির হলেন। দেখলেন সাধুটি জেগেই আছেন। গঙ্গার ধারটিতে চুপ করে' বসে আছেন তন্ময় হয়ে।

"আমার ছেলেকে বাঁচান আপনি—"

তাঁর পায়ের উপর উপুড় হয়ে পড়লেন হারাধন বাবু।

"কে, হারাধন বাবু! ও কি—উঠুন—উঠুন—কি হয়েছে কি—?"

সব শুনলেন। শুনে বললেন—"আমি কি করব বলুন—আমার কি ক্ষমতা আছে—"

হারাধন বাবু অবুঝের মত কাঁদতে লাগলেন।

"দয়া করুন, দয়া করুন, আমার একমাত্র ছেলে—"

সাধু চুপ করে' রইলেন।

"বাঁচাবার কোন উপায় নেই? কোন আশাই নেই?"

"তার আয়ু যদি নিঃশেষ হয়ে থাকে—" এই পর্য্যন্ত বলে' আবার নীরব হলেন তিনি।

হারাধন বাবু ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন।

"আমার একমাত্র ছেলে। কিছু একটা করুন আপনি। ইচ্ছে করলেই আপনি পারেন। সত্যি কোন উপায় নেই—নিশ্চয় আছে কিছু—দয়া করুন আপনি—"

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সাধু বললেন—"শুনেছি অপরে কেউ যদি নিজের আয়ু দান করে তাহ'লে নাকি আয়ুহীন লোক বাঁচতে পারে কিছুদিন। কিন্তু তা কি করে সম্ভব?

"আপনি ইচ্ছে করলে সব পারেন—দয়া করুন।"

সাধুর পায়ে ধরে ছেলেমানুষের মতো কাঁদতে লাগলেন হারাধন বাবু।

বিব্রত সাধু নিজের পা সরিয়ে নিয়ে অপ্রস্তুত মুখে উঠে দাঁড়ালেন। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন "ভগবানকে ডাকুন, তিনি যদি দয়া করেন সব হ'তে

পারে। তিনিই একমাত্র ভরসা, তাঁকেই ডাকুন। আমরা কে—”

অনেক করে’ বুঝিয়ে হারাধন বাবুকে বাড়ী পাঠিয়ে দিলেন তিনি।

হারাধন বাবু বাড়ী ফিরে দেখলেন ছেলের অবস্থার উন্নতি হয়েছে। ডাক্তারকে ডেকে পাঠালেন। তিনি দেখে বিস্মিত হলেন—নাড়ির অবস্থা ফিরেছে, আর ভয় নেই। ক্রমশঃ ভালর দিকে যেতে লাগল। মেঘাচ্ছন্ন আকাশের মেঘ যখন কাটতে স্বরু করে তখন যেমন দেখতে দেখতে সব পরিষ্কার হয়ে যায় হারাধন বাবুর ছেলের অবস্থা তেমনি দেখতে দেখতে ভাল হয়ে উঠল। পরদিন বেলা দশটা নাগাদ ডাক্তারেরা বললেন—“আর ভয় নেই, টালটা সামলে গেছে। এ যাত্রা বেঁচে যাবে বলেই মনে হচ্ছে—”।

উল্লসিত হারাধন বাবু সাধুটিকে খবর দিতে ছুটলেন। সেখানে পৌঁছে কাউকে দেখতে পেলেন না। ডাকলেন —সাড়া পেলেন না। ভিতরে ঢুকে দেখলেন আপাদ-মস্তক ঢাকা দিয়ে শুয়ে ঘুমুচ্ছেন। আবার ডাকলেন উত্তর পেলেন না। ঠেললেন—তবু সাড়া নেই। গায়ের চাদরটা সরিয়ে চমকে উঠলেন। প্রাণহীন

মৃত-দেহটা পড়ে আছে শুধু—মুখে অদ্ভুত একটা প্রশান্ত হাসি।

•

অধরা •

অন্ধকারে একা ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম মাঠে। সে-ও সঙ্গে ছিল। তার-অঙ্গসৌরভ, বলয়-নিক্কণ, নিশ্বাসের মৃদু শব্দ সমস্তই অনুভব করছিলাম। পাশাপাশি ছিল, অতিশয় কাছাকাছি। মুখে কথা ছিল না। আমারও না, তারও না। আলাপ বন্ধ ছিল না তবু। দু'জনেই কথা কইছিলাম। কিন্তু নীরবে। তার সমস্ত অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ পরিস্ফুট হয়ে উঠছিল আমার কল্পনায়। তাই যখন নীরব ভাষায় সে আমাকে প্রশ্ন করলে—"আমাকে তুমি তো কখনও দেখনি, তবু চাইছ কেন এত করে?"—

তখন আমি অসঙ্কোচে উত্তর দিলাম—"তোমাকে আমি জানি।"

"কি করে' জানলে ?"

"কি করে' তা জানি না, কিন্তু জানি।"

নিবিড়তর হয়ে উঠল অন্ধকার।

পাশাপাশি হাঁটলাম অনেকক্ষণ···কতক্ষণ মনে নেই। মনে হচ্ছিল শতাব্দীর পর শতাব্দী পার হয়ে যাচ্ছে।··· সহসা তার আর একটা নীরব প্রশ্ন সঞ্চারিত হল আমার মনে।

"এত করে' চাইছ যদি নিচ্ছ না কেন।"

"ধরা দিলে কই ?"

মদিরতর হয়ে উঠল তার অঙ্গ সৌরভ।

মনে হল তার চকিত দৃষ্টির চাহনি বিদ্যুতের মতো চিরে চলে গেল অন্ধকারকে। চতুর্দ্দিক্ বিদ্যুতায়িত হয়ে উঠল ক্ষণকালের জন্য।

"সর্ব্বদা ধরে রেখেছ, তবু বলছ ধরা দিইনি !"

"আমি যেখানে চাই সেখানে দাওনি।"

"কোথায় চাও ?"

"ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রলোকে।"

দ্রুততর হয়ে উঠল তার নিশ্বাস। স্পন্দিত হয়ে উঠল অন্ধকার···মনে হল খুব কাছে সরে' এসেছে···

তার চোখের জল গালে পড়ল আমার···এক ফোঁটা ঠাণ্ডা জল···বরফের মতো ঠাণ্ডা···

সহসা সচেতন হলাম, বৃষ্টি পড়ছে। বাড়ির দিকে ফিরলাম। সে-ও চলেছে। মুষলধারা নামল। ছুটছি··· সে-ও ছুটছে সঙ্গে সঙ্গে। সহসা অতিশয় কাছে এসে পড়ল যেন···তার ভিজে শাড়ীর স্পর্শ পেলাম মনে হল।···পাশাপাশি ছুটে চলেছি। নির্জ্জন পথ উর্দ্ধশ্বাসে পার হলাম নীরবে।—তারপর সুদীর্ঘ গলিটা। নীরন্ধ্র অন্ধকার। গলির শেষে আমার প্রকাণ্ড নির্জ্জন বাড়িটা দৈত্যের মতো দাঁড়িয়ে আছে। এখনই গ্রাস করবে আমাকে। দ্রুতপদে বারান্দায় উঠলাম। সে-ও উঠল। ঘুরে ঢুকলাম, সে-ও ঢুকল। সুইচ্ টিপলাম তাড়াতাড়ি —তীব্র আলোয় ভরে উঠল চতুর্দ্দিক। দেখি, কেউ নেই।

প্রজাপতি

নীল শেড দেওয়া ইলেকট্রিক বাতিটার উপর কয়েকদিন থেকে একটি প্রজাপতি এসে বসছে। যতক্ষণ আমি টেবিলে বসে লেখা-পড়া করি ও শেড্‌টির উপরে চুপ করে' বসে থাকে। আশা মারা যাবার কিছুদিন পর থেকে ওই আমার সন্ধ্যাবেলার সঙ্গী হয়েছে।

বন্ধু সোমেশ্বর এসে প্রবেশ করলেন। ইদানীং প্রায় আসছে। ওকে দেখলেই আমার ভয় করে। ওর বোন বেলার সম্বন্ধে আজকাল যে একটু দুর্ব্বলতা পোষণ করছি সেটা ও টের পেয়ে গেছে। বেকায়দায় পড়ে গেছি। সোমেশ্বর এসেই কাজের কথা পাড়লে একেবারে

"বেলার সম্বন্ধে কি ঠিক করলে ?"

চুপ করে' রইলাম।

"যা হোক একটা ঠিক করে' ফেল ভাই"—তারপর একটু থেমে বললে—"শেষ পর্য্যন্ত বিয়ে তো করবেই সবাই করে, বেলাকে যদি কর ; আমি নিশ্চিন্ত হই বেলা তোমাকে ভালও বাসে—"

সবই ঠিক—তবু চুপ করে রইলাম। আশা যখন বেঁচেছিল তখন তাকে বলেছিলাম যে আর কখনও বিয়ে করব না—এখন বুঝতে পারছি বিয়ে করতে হবে—বেলাকেই করতে হবে—কিন্তু দ্বিধাটা কাটিয়ে উঠতে পারছি না কিছুতেই।

"চুপ করে আছ কেন? তোমার সত্যি যদি মত না থাকে আমি জোর করতে চাই না। খুলে বলো সেটা। তাহলে দ্বিজেনের সঙ্গে চেষ্টা করি। তুমি রাজী হলে অবশ্য আর কোথাও যাব না আমি। দ্বিজেনের ভাব ভঙ্গী থেকে মনে হয় সে আপত্তি করবে না, তবে…"

ওই খোঁচা-গোঁফ-ওলা দ্বিজেন বেলাকে বিয়ে করবে!

ওর সে মতলব আছে না কি?

বললাম—"দ্বিজেনের কাছে যাবার দরকার নেই। আমিই বিয়ে করব। তবে কিছুদিন সময় দাও ভাই।"

"তুমি কথা দিলে অপেক্ষা করতে পারি।"

চুপ ক'রে রইলাম।

"কথা দিচ্ছ তো?"

"দিচ্ছি।"

"বেশ। বেলাকে সুখবরটা দিয়ে আসি তাহলে।"

সোমেশ্বর চলে গেল।

এরপর যা ঘটল তা অবিশ্বাস্য।

হঠাৎ আশার কণ্ঠস্বরে কে যেন বলে উঠল—"তাহ'লে আমার দায়িত্বও ফুরোল—আমিও চললাম।"

প্রজাপতিটা উড়ে জানালা দিয়ে বেরিয়ে চলে গেল।

একই ব্যক্তি

বাক্স খুলে তাঁর এই চিঠিখানা পেলাম।

শ্রীমতী অসীমাসুন্দরী দেবী

প্রাণাধিকাসু,

দেখ তো, মিছি মিছি আমায় এত ভাবিয়েছিলে। কত রকম 'হয়তো' যে এসে আমায় চিন্তিত করে তুলেছিল তার আর ঠিক নেই। বড় চিঠি না লিখলে উত্তর দেবে না? কত বড়? ক'হাত লম্বা ক'হাত চওড়া চিঠি চাও? শেলী, রবীন্দ্রনাথই তো তোমার প্রিয় কবি জানতাম, হঠাৎ 'মিলটনি' ফরমাস করে' বসছ কেন, বুঝতে পারছি না। যাক্—চেষ্টা করব তবু।

রাগ করেছি কি না? তুমি এ অবস্থায় কি করতে! রাগের চেয়ে আমার ভয়ই বেশী হয়েছিল কিন্তু। আমার গা ঘেসে আশঙ্কাও থাকে যে। আমি কয়েকদিন থেকে রোজই তোমার চিঠি আশা করছি। দু'একদিন পোস্টাফিস পর্য্যন্ত গেছি। চিঠি না আসাতে সত্যিই খুব খারাপ লাগছিল।

আচ্ছা, তোমার কাসি এখনও সারছে না কেন বলত? কাসি একেবারে না সারা পর্য্যন্ত গান গেয়ো না। সেরে গেলেই গাইতে হবে কিন্তু। তুমি লিখেছ, "ভগবান বোধহয় দয়া করে' বিয়ের সময়টুকু পর্য্যন্ত গানের গলাটা একেবারে নষ্ট করে' দেন নি। ভগবানের অসীম দয়া। আজকাল ভাবছেন এখন আর গান দিয়ে কি দরকার……"

তোমার অসীম দয়াময় ভগবানকে বলো—প্রভু যা যা করবার তা'তো করেইছ, এখন দয়া করে' তোমার দয়াটুক ফেরত নাও, আমি একটু গান গেয়ে বাঁচি। না হয় তোমায় কিছু 'সিন্নি' দেব! তোমার এই করুণাময় ভগবানটির সঙ্গে আমার যে আলাপ নেই—থাকলে আমিই আমার সিমুর জন্যে অনুরোধ করতাম একটু। সেতার বাজানোটা ছেড়ে দিলে সত্যি সত্যি? টাকার জন্যে ভাবছ কেন? তোমার টিউটারের মাইনে আমি যেমন করে' হোক পাঠাব। লিখছ—পরে শিখব। কিন্তু আমার নিজের জীবনে দেখেছি যেটা পরে শিখব বলে' ফেলে রেখেছি তা আর শেখা হয় নি। টাকার জন্যে ভেবো না তুমি, অত সঙ্কোচেরও দরকার নেই, অবিলম্বে আরম্ভ কর সেতার।

…এখন রাত্রি অনেক। রাস্তায় লোক চলাচল বন্ধ হয়েছে। বারোটা বেজে গেছে বোধ হয়। বোধ হয় বলছি তার কারণ আমার প্রৌঢ় 'টাইম পীস'টি কেন জানি না হঠাৎ সাতটা এগারো মিনিটে থেমে গেছেন। কেমন যেন একটা তন্ময় ভাব। পথ-চলতি পথিক যেন হঠাৎ কিছু দেখে মুগ্ধ হয়ে গেছে, কিম্বা হঠাৎ কোন স্মৃতি এসে মনের গতি-রোধ করে দিয়েছে ওর। থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে যেন। আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে এই ঘড়ি যখন দোকানদারের গ্লাস কেসে বন্ধ ছিল তখন হয়তো কোন একটি সুন্দর সোনার হাত ঘড়ি এর পাশে থাকত। দুজনের ভাবও হয়েছিল হয়তো। হয়তো ভেবেছিল কোনদিন ছাড়াছাড়ি হবে না। সুন্দর স্বচ্ছ কাচের ঘরটিতে পাশাপাশি দিনের পর দিন কেটে যাবে। কিন্তু হঠাৎ একদিন খরিদ্দার এসে হাজির। গরীব খরিদ্দার আমি কিনে নিলাম 'টাইম পীস্'টিকে। সোনার হাত-ঘড়ি গিয়ে অলঙ্কৃত করল কোন ধনীর মণি-বন্ধ। আজ চাঁদনি রাত, আমার 'টাইম পীস্' হয়তো তার সঙ্গিনীর কথা ভেবে ৭টা ১১ মিনিটের ঘরে থেমে আছে—খেয়ালই নেই যে সময় বয়ে চলছে। থাক, একে আজ দম দিয়ে চালাব

না? সোনার হাত ঘড়িটিও কি এর কথা ভাবছে আজ? ...অদ্ভুত জ্যোৎস্না উঠেছে। আমার কিন্তু জ্যোৎস্নার চেয়ে ঘনঘোর বর্ষা বেশি ভাল লাগে। "আজু মধু চাঁদনী প্রাণ উন্মাদনী"—সত্যি কথা, কিন্তু এর চেয়েও—

কুলিশ শত শত পাত মোদিত
ময়ূর নাচত মাতিয়া
মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী
ফাটি যাওত ছাতিয়া

এই অবস্থাটা আরও বেশি ভাল লাগে আমার। অনেক কবি চাঁদের সঙ্গে প্রিয়ার মুখের তুলনা করেছেন। আমার এতকাল প্রিয়া ছিল না, জিনিসটা পড়েই এসেছি, মন্দও লাগেনি। এখন কিন্তু সিমুর মুখের সঙ্গে চাঁদের কোন রকম সাদৃশ্য আছে ভাবলেও রাগ হয়। একটুও নেই, থাকতেই পারে না। প্রথমতঃ, চাঁদের আলো ধার-করা, সিমুর আলো সিমুরই। দ্বিতীয়তঃ, চাঁদ তার এই ধার-করা রূপ নিয়ে আকাশে সমস্ত রাত 'ধরণা' দিয়ে পড়ে আছে, খেয়ালী-হাওয়ায় ভেসে-আসা যে কোন চল্‌তি মেঘ তাকে জড়িয়ে ধরে' যতক্ষণ খুশি থাকছে রূপালী নেশায় বিভোর হয়ে। চাঁদের এতটুকু

লজ্জা-সরম নেই। এ যেন কোন পথচারিণী অভিসারিকা পাউডার পমেড মেখে রূপের বেসাতি করতে বেরিয়েছে। এর সঙ্গে কি আমার সিমুর লজ্জামাখা সুন্দর মুখখানির তুলনা সম্ভব? আমি চোখের সামনে মুখখানি দেখতে পাচ্ছি যে। লজ্জা হলে' আবার চোখে হাত দেওয়া হয়। আমার চোখে-চোখে চেয়ে কতদিন কথা বল নি মনে আছে? এটা কিন্তু বাড়াবাড়ি হয়েছিল তোমার। শুভদৃষ্টি পর্য্যন্ত করনি—কম দুষ্টু নাকি তুমি। তোমার সঙ্গে চাঁদের তুলনা চলতেই পারে না। হ্যাঁ, একটা কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেল। একটি কবি চাঁদের সম্বন্ধে বড় খাঁটি কথা বলেছেন। ভারতচন্দ্র। লোকটা সত্যিই প্রিয়াকে ভালবাসত।

"কে বলে শারদশশী সে মুখের তুলা
পদ-নখে পড়ে' তার আছে কতগুলা॥"

…আজ অনেক কথা লিখতে ইচ্ছে করছে।…কত কথা। এই গভীর রাত, চারিদিকে জোৎস্না, একা ঘর, বেচারি ঘড়িটি পর্য্যন্ত চুপ করে' চেয়ে আছে, তার মৌন ব্যথিত দৃষ্টিতে যেন আমার মনের কথাটি ফুটে রয়েছে।

ঠিক এই মুহূর্ত্তে তুমি আমার মনের কত নিকটে আছ…অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে…অথচ দুজনের দেহের

মধ্যে প্রায় ৪০০ মাইল ব্যবধান। ব্যবধান সত্ত্বেও কিন্তু মনে হচ্ছে তোমাকে পেয়েছি, এসেছ তুমি আমার কাছে। দেখতে পাচ্ছি তুমি শুয়ে ঘুমচ্ছ… এলোমেলো কয়েকটা চুল কাঁপছে কপালের উপর…কান দু'টি চুল দিয়ে ঢাকা…চোখ বুজে আমারই বালিশে মাথা রেখে ঘুমুচ্ছ…

কুড়ি বছর আগেকার চিঠি।

একি শুধু, কথাই? মনের কথা নয়? কি জানি আমার কেমন যেন সন্দেহ হয় মাঝে মাঝে। বিয়ের পূর্ব্বে এঁর সম্বন্ধে যা শুনেছিলাম, বিয়ে করে' দেখলাম ঠিক সে-রকমটি নন তিনি। কেমন যেন ভালমানুষ গোচের। সর্ব্বদাই আমার সামান্যতম অসুবিধা দূর করবার জন্যে ব্যস্ত। তারপর ক্রমশঃ কতদিন কাটল। ক্রমশ কেমন বদলে গেলেন যেন। এখন মনে হচ্ছে [illegible] চিনতে পারি নি। অথচ একসঙ্গে কুড়ি বচ্ছর একাদিক্রমে এক ঘরে বাস করেছি। এক বিছানায় শুয়েছি। এঁরই সাতটি সন্তানের জননী আমি। পাড়া-পড়শী আত্মীয়-স্বজন সকলের চক্ষেই আমরা আদর্শ দম্পতি ছিলাম।

কিন্তু একথা আজ স্বীকার করছি, আমাদের মনের মিল হয় নি। উনি যে-জগতের লোক ছিলেন, সে জগতে আমি অস্বস্তি বোধ করতাম। চিঠিতে ওঁর যে কান্ত-কোমল রূপ ফুটে উঠেছে, আসলে কিন্তু সেরকম লোক ছিলেন না উনি। অত্যন্ত রাশভারি কড়া মেজাজের লোক ছিলেন। পান থেকে চূণ খসবার উপায় ছিল না। দিনরাত লেখাপড়া নিয়েই থাকতেন এবং নির্জনে থাকতে ভালবাসতেন। কাছাকাছি কেউ জোরে কথা বললেও বিরক্ত হতেন। বকতেন, এমনকি মারধোরও করতেন। ছেলেমেয়েরা এর জন্যে কত বকুনি খেয়েছে, ঝি-চাকর কতবার লাঞ্ছিত হয়েছে। অসুস্থ হলে পশুরা যেমন নির্জন স্থান খুঁজে আশ্রয় নেয়, কারও সান্নিধ্য পছন্দ করে না, ওঁরও অবস্থা অনেকটা তেমনি ছিল। এক-আধ দিন নয়, সারাজীবনই উনি এমনিভাবে কাটিয়েছেন। অথচ শরীর ওঁর বেশ সুস্থই ছিল। কেন যে এমন করতেন জানি না। মোট কথা, আমি বুঝতে পারিনি ওঁকে। একটা জিনিষ কিন্তু বলব—খুব কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ছিলেন। জীবনে কখনও কোন অকর্তব্য করেন নি। আমাদের আধিভৌতিক কোন অসুবিধা ঘটতে দেন নি। যতদিন বেঁচে ছিলেন,

আমাদের কোন কষ্ট ছিল না। মৃত্যুর পরও কোনও কষ্ট নেই। ছেলেদের মানুষ করে' গেছেন, মেয়েদের বিয়ে দিয়ে গেছেন, শহরে পাকা বাড়ি করে' গেছেন, লাইফ ইন্‌সিওরেন্স করে, গেছেন। সেদিক দিয়ে আমার কোন কষ্ট নেই। তবে এতদিনের সঙ্গীকে হারিয়ে একটা অভাব বোধ করছি বই কি। আর একটা কথা। তিনি মুখে যদিও বলেন নি কিছু কখনও (চিঠিতে অত কথা লিখতেন, মুখে কিন্তু বলতেন না কিছু) তবু এটা আমি অনুভব করতাম যে, তিনি আমাকে ভালবাসেন। মৃত্যুদিনের সে ঘটনাটা ভুলব না কখনও।

ডাক্তারবাবু আসতেই বললেন, চিকিৎসার জন্যে নয়—দেখা করবার জন্যে ডেকে পাঠিয়েছি। চললুম—

"কোথায় ?"

"কোথায় আবার। হুকুম এসেছে,—"

"ওসব কথা বলছেন কেন। কোন কষ্ট হচ্ছে ?"

"হ্যাঁ, বুকের কাছে একটু। ওসব কিছু নয়, সিমু তুমি একটা গান গাও—"

"কোন্‌টা গাইব।"

"যেটা খুশি।"

ডাক্তারবাবুর দিকে চাইলাম।

তিনি বললেন—"হ্যাঁ, গান' না।"

ধরলাম—"জীবন-মরণের সীমানা ছড়ায়ে···"

গান শুনতে শুনতেই মারা গেলেন তিনি।

আজ নীলিমা আসবে। অত্যন্ত অধীর-চিত্তে তার প্রতীক্ষা করছি। নীলিমার অদ্ভুত ক্ষমতা, তার শরীরে নাকি প্রেতাত্মা ভর করে। যে-কোন লোকের প্রেতাত্মা সে নাকি আনতে পারে। সেদিন বকুল মাসীকে আনিয়েছিল নাকি। বকুল মাসীর গলার স্বর নাকি অবিকল শুনতে পেয়েছিল তার ছেলেরা।

নীলিমার চোকমুখ হঠাৎ কেমন যেন বদলে গেল। চোখের দৃষ্টিও কেমন হয়ে গেল যেন।

একি, এ যে ঠিক তাঁরই দৃষ্টি। নির্নিমেষে আমার দিকে চেয়ে আছে।

"আমাকে ডেকেছ কেন?

অবিকল তাঁরই গলার স্বর।

একটু ইতস্ততঃ করে' বললাম, "আমাকে চিনতে পারছ না ?"

"না।"

"একবারেই চিনতে পারছ না ?"

"না।"

"আমাদের মনে পড়ে না তোমার ?„

"না।"

"একটুও না ?"

"না।"

তাজমহল

প্রথম যখন আগ্রা গিয়েছিলাম তাজমহল দেখতেই গিয়েছিলাম। প্রথম দর্শনের সে বিস্ময়টা এখনও মনে আছে। ট্রেণ তখনও আগ্রা স্টেশনে পৌঁছয় নি। একজন সহযাত্রী বলে' উঠলেন—ওই যে তাজমহল দেখা যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি জানালা দিয়ে মুখ বাড়ালাম।

ওই যে—

দূর থেকে দিনের আলোয় তাজমহল দেখে দ'মে গেলাম। চূণ-কাম-করা সাধারণ একটা মসজিদের মতো! ওই তাজমহল। তবু নির্নিমেষে চেয়ে রইলাম। হাজার হোক তাজমহল। শা-জাহানের তাজমহল।......... অবসন্ন অপরাহ্নে বন্দী শা-জাহান আগ্রা দুর্গের অলিন্দে বসে' এই তাজমহলের দিকেই চেয়ে থাকতেন। মমতাজের বড় সাধের তাজমহল।......আলমগীর নির্ম্মম ছিলেন না। পিতার ইচ্ছা অপূর্ণ রাখেন নি তিনি...... মহাসমারোহে মিছিল চলেছে...........সম্রাট্ শা-জাহান চলেছেন প্রিয়া-সন্নিধানে?...আর বিচ্ছেদ সইল না... শবাধার ধীরে ধীরে নামছে ভূগর্ভে ... ওই তাজমহলেই মমতাজের ঠিক পাশে শেষ-শয্যা প্রস্তুত হয়েছে তাঁর। আর একটা কবরও ছিল...হয় তো এখনও আছে...... ওই তাজমহলেরই পাশে। দারা সেকোর...

চূণকাম-করা সাধারণ মসজিদের মতো তাজমহল দেখতে দেখতে মিলিয়ে গেল।

পূর্ণিমার পরদিন। তখনও চাঁদ ওঠে নি। জ্যোৎস্নার পূর্ব্বাভাষ দেখা দিয়াছে পূর্ব্ব দিগন্তে। সেই দিন সন্ধ্যার পর দ্বিতীয়বার দর্শন করতে গেলাম তাজমহলকে।

অনুভূতিটা স্পষ্ট মনে আছে এখনও। গেট পেরিয়ে ভিতরে ঢুকতেই অস্ফুট মর্ম্মর-ধ্বনি কানে এল। ঝাউ-বীথি থেকে নয়—মনে হল যেন সুদূর অতীত থেকে, মর্ম্মর-ধ্বনি নয়, যেন চাপা কান্না। ঈষৎ আলোকিত অন্ধকারে পুঞ্জীভূত তমিস্রার মতো স্তূপিকৃত ওইটেই কি তাজমহল? ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে লাগলাম। মিনার, মিনারেট গম্বুজ স্পষ্টতর হতে লাগল ক্রমশঃ। শুভ্র আভাষও ফুটে বেরুতে লাগল অন্ধকার ভেদ করে'। তারপর অকস্মাৎ আবির্ভূত হল—সমস্তটা মূর্ত্ত হয়ে উঠল যেন সহসা বিস্মিত চেতনা-পটে। চাঁদ উঠল। জ্যোৎস্নার স্বচ্ছ ওড়নায় অঙ্গ ঢেকে রাজ-রাজেশ্বরী শাজাহান-মহিষী মমতাজের স্বপ্নই অভ্যর্থনা করলে যেন আমাকে এসে স্বয়ং। মুগ্ধ দৃষ্টিতে নির্ব্বাক্ হয়ে চেয়ে রইলাম।

তারপর অনেক দিন কেটেছে

কোন্ কনট্রাক্টার তাজমহল থেকে কত টাকা উপার্জ্জন করে, কোন্ হোটেল-ওলা তাজমহলের দৌলতে রাজা বনে' গেল, ফেরিওলাগুলো বাজে পাথরের ছোট ছোট তাজমহল আর গড়গড়ার মতো সিগারেট পাইপ বিক্রি করে' কত পয়সা পেটে রোজ, নিরীহ আগন্তুদের ঠকিয়ে টোঙাগুলো

কি ভীষণ ভীষণ ভাড়া নেয়—এ সব খবরও পুরানো হয়ে গেছে। অন্ধকারে, জ্যোৎস্নালোকে, সন্ধ্যায়, উষায় শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা-শরতে বহুবার বহুরূপে দেখেছি তারপর তাজমহলকে। এতবার যে আর চোখে লাগে না। চোখে পড়েই না। পাশ দিয়ে গেলেও নয়। তাজমহলের পাশ দিয়ে প্রায়ই যাতায়াত করতে হয় আজকাল। আগ্রার কাছেই এক দাতব্য চিকিৎসালয়ে ডাক্তার হয়ে এসেছি আমি। তাজমহল সম্বন্ধে আর মোহ নেই। একদিন কিন্তু—গোড়া থেকেই শুনুন তাহলে।

সেদিন 'আউট ডোর' সেরে বারান্দা থেকে নামছি, এক বৃদ্ধ মুসলমান গেট দিয়ে ঢুকলো। পিঠে প্রকাণ্ড একটা ঝুড়ি বাঁধা। ঝুড়ির ভারে মেরুদণ্ডটা বেঁকে গেছে বেচারীর। ভাবলাম কোনও মেওয়া-ওলা বুঝি। ঝুড়িটা নামাতেই কিন্তু দেখতে পেলাম ঝুড়ির ভেতর, মেওয়া নয়, বোরখাপরা মহিলা বসে' আছে একটি। বৃদ্ধের চেহারা অনেকটা বাউলের মতো, আলখাল্লা পরা, ধপধপে সাদা দাড়ি। এগিয়ে এসে আমাকে সেলাম করে' চোস্ত উর্দ্দু ভাষায় বললে—নিজের বেগমকে পিঠে করে' বয়ে এনেছে সে আমাকে দেখাবে বলে'। নিতান্ত গরীব সে। আমাকে বাড়ি নিয়ে গিয়ে 'ফি' দিয়ে

দেখাবার সামর্থ তার নেই। আমি যদি মেহেরবানি করে'—

কাছে যেতেই দুর্গন্ধ পেলাম একটা। হাঁসপাতালের ভিতরে গিয়ে বোরখা খুলতেই (আপত্তি করেছিল সে ঢের) ব্যাপারটা বোঝা গেল। ক্যাংক্রাম্ অরিস! মুখের আধখানা পচে' গেছে। ডানদিকের গালটা নেই। দাঁতগুলো বীভৎস-ভাবে বেরিয়ে পড়েছে। দুর্গন্ধে কাছে দাঁড়ান যায় না। দূর থেকে পিঠে করে' ব'য়ে এনে এ রোগীর চিকিৎসা চলে না। আমার ইনডোরেও জায়গা নেই তখন। অগত্যা হাঁসপাতালের বারান্দাতেই থাকতে বললাম। বারান্দাতেও কিন্তু রাখা গেল না শেষ পর্যন্ত। ভীষণ দুর্গন্ধ! অন্যান্য রোগীরা আপত্তি করতে লাগল। কম্পাউণ্ডার, ড্রেসর এমন কি মেথর পর্য্যন্ত কাছে যেতে রাজী হল না। বৃদ্ধ কিন্তু নির্ব্বিকার। দিবারাত্রি সেবা ক'রে চলেছে। সকলের আপত্তি। দেখে সরাতে হ'ল বারান্দা থেকে। হাঁসপাতালের কাছে একটা বড় গাছ ছিল। তারই তলায় থাকতে বললাম। তাই থাকতে লাগল। হাসপাতাল থেকে রোজ ওষুধ নিয়ে যেত। আমি মাঝে মাঝে গিয়ে ইনজেক্সান দিয়ে আসতাম। এভাবেই চলছিল।

একদিন মুসলধারে বৃষ্টি নামল। আমি 'কল' থেকে ফিরছি হঠাৎ চোখে পড়ল বুড়ো দাঁড়িয়ে ভিজছে। একটা চাদরের দুটো খুঁট গাছের ডালে বেঁধেছে আর দুটো খুঁট নিজে দুহাতে ধরে' দাঁড়িয়ে আছে। চাদরের তলায় রয়েছে বেগম সাহেব। নির্ব্বিকারভাবে দাঁড়িয়ে ভিজছে লোকটা! মোটর ঘোরালাম। সামান্য চাদরের আচ্ছাদনে মুষলধারা আটকায় না। বেগম সাহেব দেখলাম আপাদমস্তক ভিজে গেছে। কাঁপছে ঠক ঠক করে। আধখানা মুখে বীভৎস হাসি। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে।

বললাম—হাসপাতালের বারান্দাতেই নিয়ে চল আপাতত। বৃদ্ধ হঠাৎ প্রশ্ন করলে—এর বাঁচবার কি কোনও আশা আছে হুজুর।

সত্যি কথাই বলতে হল—না।

বুড়ো চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। আমি চলে এলাম।

পরদিন দেখি গাছতলা খালি। কেউ নেই।

আরও কয়েকদিন পরে—সেদিনও কল থেকে ফিরছি—একটা মাঠের ভিতর দিয়ে আসতে আসতে বুড়োকে

দেখতে পেলাম। কি যেন করছে বসে' বসে'। ঝাঁ ঝাঁ করছে দুপুরের রোদ। কি করছে বুড়ো ওখানে? মাঠের মাঝখানে মুমূর্ষু বেগমকে নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়েছে না কি? এগিয়ে গেলাম। কতকগুলা ভাঙ্গা ইট আর কাদা নিয়ে বুড়ো কি যেন গাঁথছে।

"কি হচ্ছে এখানে মিয়া সাহেব—"

বৃদ্ধ স-সম্ভ্রমে উঠে দাঁড়িয়ে ঝুঁকে সেলাম করলে আমাকে।

"বেগমের কবর গাঁথছি হুজুর।"

"কবর?"

"হাঁ হুজুর।"

চুপ করে' রইলাম। খানিকক্ষণ অস্বস্তিকর নীরবতার পর জিজ্ঞাসা করলাম—"তুমি থাক কোথায়?"

"আগ্রার আশে পাশে ভিক্ষে করে' বেড়াই গরীব-পরবর।"

"দেখিনি তো কখনও তোমাকে। কি নাম তোমার?"

"ফকির শা-জাহান।"

নির্ব্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

হিসাব

দুই আর দুই যোগ করে' যতক্ষণ চার হয় ততক্ষণ কোন গোল থাকে না। কিন্তু যদি কোন কারণে তা না হয় তাহলেই আমরা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ি। পদির ব্যাপারে তেমনি বিভ্রান্ত হয়ে আছি।

ভাল নাম পদ্মাবতী, ডাক নাম পদি।

অত্যন্ত গরীবের মেয়ে। উপযুক্ত সহৃদয় আত্মীয়স্বজন এমন কেউ নেই যে 'ভার' নেয়। গরীবের মেয়ে হলেই বাধ্য হয়ে গৃহকর্ম্মনিপুণা হতে হয়। তা না হলে বাসন-মাজা, কাপড়-কাচা, রান্না করা, উঠোন ঝাড় দেওয়া, ঘর নিকানো, গোয়াল পরিষ্কার করা কে করবে। পদি নিজের ঘরের কাজ তো সব করতোই, পাড়াপড়শীর ফরমাসও শুনত। কারো বড়ি দিয়ে দিচ্ছে, কারও সেলাই করে দিচ্ছে, কারো ছেলে আগলাচ্ছে। মামাদের অবস্থা একটু ভাল। কিন্তু তাঁরাও এমন লক্ষ্মী মেয়ের 'ভার' নিতে চান না। পাত্র কোথায়? তাছাড়া চারদিকেই লকলক্ করছে আগুন—ঘৃত-কুম্ভের ভার নেবে কে?

দুই আর দুই যোগ করে' ঠিক চার হয়ে যাচ্ছিল, আমরা নিশ্চিন্ত ছিলাম।

পদির নামে একটা কলঙ্ক রটল, পাড়ায় দু' একটা ছোঁড়া তাকে ইসারাও করল।—চলছিল। হিসেবে ভুল হয়নি।

আমরা জানতাম পদির বিয়ে হবে না এবং শেষ পর্য্যন্তও—সম্ভব্য পরিণতিগুলোকে স্পষ্টরূপে আর ভাববার চেষ্টা করতাম না। তবুও সেগুলো বিভ্রান্ত করেনি আমাদের, কারণ সেগুলো সব দুই আর দুইয়ে চারের পর্য্যায়ে। হিসেবের মধ্যেই।

হঠাৎ একদিন কিন্তু আচমকা এমন একটা কাণ্ড ঘটল যার জন্যে আমরা প্রস্তুত ছিলাম না।

গ্রামেরই ছেলে রামচরণ ছুটিতে এক-দিন গ্রামে ফিরে এল। রামচরণ নামটা যেমন ঘষা-পয়সার মতো, লোকটা তেমন নয়। বেশ জাঁদরেল লোক। রাজ-সরকারে হাজারখানেক না হাজার দেড়েক টাকা মাইনে পায়। ফার্ষ্ট ক্লাস ছাড়া চড়েনা। প্রত্যেক ছেলের জন্য একজন করে আয়া আছে। চার ছেলে, চার মেয়ে। হঠাৎ স্ত্রী-বিয়োগ হবার পর এই রামচরণ একদিন দেশে ফিরে এল এবং শুনলে

বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না—ওই পদিকে বিয়ে করে' বসল।

আমরা চম্‌কে গেলাম বটে কিন্তু অঙ্ক কষে' দেখলাম হিসেব ঠিক মিলেছে। পদ্মাবতী রূপসী ছিল। অবিশ্বাসী মন অবশ্য বাজে তর্ক তুলেছিল দু' একটা। পদ্মার চেয়ে বেশী রূপসী আর একটি মেয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ এসেছিল তার, নিখুঁত সুন্দরী সে, বংশও ঢের ভাল, ধরেও ছিল তারা খুব—তবু রামচরণ পদ্মাকেই পছন্দ করলে কেন। পছন্দ-অপছন্দর নিগূঢ় হেতুটা কি? মনের এসব বাজে কৌতুহলকে অবশ্য প্রশ্রয় দিই নি। পছন্দ হয়েছে বিয়ে করছে—দুই আর দুইয়ে চার-এর আবার 'কেন' কি!

পদিকে বিয়ে করাতে রামচরণ দেব-পদ-বাচ্য হয়ে উঠল প্রায়। চারিদিকে ধন্য ধন্য পড়ে গেল। পদি খুব খুশি। একগা গয়না, দামী, কাপড়, জামা মাথায় চওড়া সিঁদুর, একমুখ হাসি, তার আলাদা রূপই খুলে গেল একটা।

যাবার দিনে ষ্টেশনে গেলাম সবাই। রিজার্ভ ফার্ষ্ট ক্লাস গাড়ি—ফুলপাতা দিয়ে সাজানো হয়েছে সেটাকে। রামচরণ উঠে বসল। ছেলেমেয়েরা পাশের কামরায়

ছিল। পদি উঠেই এক কাণ্ড করে বসল। উঠেই উপরের দিকে চেয়ে 'আঁঃ' বলে চীৎকার করে' উঠল সে। তারপরই অজ্ঞান। সমস্ত দেহ থরথর করে কাঁপতে লাগল। মুখের সমস্ত হাসি মিলিয়ে গেল— ফুটে উঠল আতঙ্ক। উপরের দিকে হাত জোড় করে' বলতে লাগল,—আমার কোন দোষ নেই, আমাকে জোর করে' বিয়ে করেছে, আমি কিছু বলি নি— কিছু কোরো না, তোমার পায়ে পড়ি···।

সম্পূর্ণ পাগল হয়ে গেল সে।

ভূত?

আজকাল ভূত বিশ্বাস করে না কি কেউ!

বড় বড় বৈজ্ঞানিকরা পদির অবচেতন মন বিশ্লেষণ করে যখন দুই আর দুইয়ে চার করবার চেষ্টায় ছিলেন তখন আর এক কাণ্ড ঘটল।

ছোট্ট একটা মাদুলি পরে পদি সেরে গেল হঠাৎ।

নিম গাছ

কেউ ছালটা ছাড়িয়ে নিয়ে সিদ্ধ করেছে।
পাতাগুলো ছিড়ে শিলে পিষছে কেউ।
কেউ বা ভাজছে গরম তেলে।
খোস দাদ হাজা চুলকুনিতে লাগাবে।
চর্ম্মরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।
কচি পাতাগুলো খায়ও অনেকে।
এমনি কাঁচাই···
কিম্বা ভেজে বেগুন-সহযোগে।
যকৃতের পক্ষে ভারী উপকার।
কচি ডালগুলো ভেঙ্গে চিবোয় কত লোক···দাঁত ভাল থাকে।
কবিরাজরা প্রশংসায় পঞ্চমুখ।
বাড়ির পাশে গজালে বিজ্ঞরা খুসী হ'ন।
বলেন—"নিমের হাওয়া ভাল, থাক, কেটোনা।"
কাটেনা, কিন্তু যত্নও করেনা।
আবর্জ্জনা জমে এসে চারিদিকে।
শান দিয়ে বাধিয়েও দেয় কেউ—সে আর এক আবর্জ্জনা।
হঠাৎ একদিন একটা নূতন ধরণের লোক এল।

মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল নিমগাছের দিকে। ছাল তুললে না, পাতা ছিড়লে না, ডাল ভাঙ্গলে না। মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল শুধু।

বলে উঠল,—"বাঃ, কি সুন্দর পাতাগুলি···কি রূপ!

থোকা থোকা ফুলেরই বা কি বাহার···এক ঝাঁক নক্ষত্র নেমে এসেছে যেন নীল আকাশ থেকে সবুজ সায়রে। বাঃ—"

খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে চলে গেল।

কবিরাজ নয়, কবি।

নিমগাছটার ইচ্ছে করতে লাগল লোকটার সঙ্গে চলে যায়। কিন্তু পারলে না। মাটির ভিতর শিকড় অনেক দূরে চলে গেছে। বাড়ির পিছনে আবর্জ্জনার স্তূপের মধ্যেই দাঁড়িয়ে রইল সে।

ওদের বাড়ির গৃহকর্ম্ম-নিপুণা লক্ষ্মী বউটার ঠিক এই দশা।

এপার ওপার

মেয়েটী কালো। যৌবনসীমা পার হয়েছে। তবু সুন্দরী। চোখে মুখে শ্রী আছে। দৃষ্টিতে ভাষা আছে। আমরা যখন গেলাম তখন সে ডিম ভাজবার আয়োজন করছিল আমাদেরই সম্বর্দ্ধনার জন্য। কাছেই হার্মোনিয়ামটা রয়েছে। তার পাশই রয়েছে ফুটফুটে ছোট্ট একটি ছেলে। তার ছেলে নয়, পাশের বাড়ির ছেলে। আমরা গিয়ে বসলাম। মেয়েটি আমাদের দিকে একনজর চেয়ে ছেলেটির সঙ্গেই কথাবার্ত্তা কইতে লাগল।

"ডিম খাবি একটু ?"

"না।"

"খা না, খেলে জাত যাবে না।"

"খাব না।"

"আচ্ছা, তা হলে গান শুনিয়ে দে এঁদের।"

রাজি হ'ল না। অনেক সাধ্যসাধনা করলে সে—কিছুতেই হ'ল না।

"কাল যে তোকে অত করে শেখালাম গানটা, ভুলে গেলি এর মধ্যে ?"

ছেলেটি উসখুস করতে লাগল। দ্বারের দিকে চাইলে একবার।

মেয়েটি আমাদের দিকে চেয়ে বললে—"আপনারা এসেছেন বলে' লজ্জা পাচ্ছে। তা না হলে আমার কথা ও খুব শোনে।"

ঝি-জাতীয় কে একজন উঁকি দিলে দ্বার প্রান্তে।

"আমাদের বাড়ির খোকন এখানে এসেছে ? ও মা, এই যে! আমরা চারিদিকে খুঁজে অস্থির। এখানে আসা কেন এমন সময়ে—চল।"

"আমিই ডেকে এনেছিলাম। যাও, বাড়ি যাও।"

উঠে চলে গেল। মেয়েটির মুখখানা কেমন যেন একটু বিমর্ষ দেখাল। আমাদের দিকে ফিরে বললে— "ও আমাকে খুব ভালবাসে, জানেন।"

ডিম ভাজতে লাগল।

নীরবে কাটল কিছুক্ষণ।

কাপ্তেন একটি ছোট বোতল, কিছু মাংস এবং পাউরুটি নিয়ে প্রবেশ করলেন। এসেই বললে— "ঘুগনি করে' রেখেছ তো ?"

"হ্যাঁ।"

খাওয়া সুরু হ'ল। ঘুগনি খুব চমৎকার হ'য়েছিল। প্রশংসা করলাম।

একজন বললেন—"ও খুব ভাল রাঁধতে পারে। সেবার—"

রান্নার গল্প সুরু হয়ে গেল। বিরিয়ানী কবাব কোপ্তার নয়, মধ্যবিত্ত রান্নার। চচ্চড়ি, সুকতো, মোচার ডালনা, মাছের ঝাল, বেগুনের টক, খিচুড়ির গল্প আর শেষ হয় না। অথচ আমরা শুনতে গেছি গজল।

...গজল অবশ্য হ'ল দু'একখানা।

তারপর কথায় কথায় উঠে পড়ল তার বাড়ির কথা। উঠে পড়তেই সে হার্মোনিয়ম ছেড়ে বাড়ির গল্প সুরু করে' দিলে। পাড়াগাঁয়ে বাড়ি তার। বাড়িতে বিধবা মা আছে, বৌদি আছে, খোকন আছে, বুধি গাই আছে। কত গল্প। একটা পল্লীকে মূর্ত্ত করে' তুললে যেন চোখের সামনে।

"পাড়ার লোক আমায় খুব ভালবাসে, জানেন। একবার আমার অসুখ করেছিল, পাড়ার সকলের নাওয়া খাওয়া বন্ধ। নায়েবমশাই কাছারি থেকে

উঠে এসে খোঁজ নিয়ে যেতেন, পুরুতমশাই রোজ শিবের মাথায় বেলপাতা দিতেন, ডাক্তারের তো কথাই নেই—রোজ তিনবার চারবার আসতেন। কত রকম ওষুধ, ইনজেক্‌সন। আমার মায়ের একটু শুচিবাই আছে, জানেন। বিলিতি ওষুধ ছুঁতেন না কিছুতে। বৌদি পাটের কাপড় পরে' ওষুধ খাওয়াতেন আমাকে—"

"ও সব বাজে কথা ছেড়ে তুমি সেই গজলটা ধর দিকি।" আদেশ করেলন কাপ্তেন।

মুখের হাসি যেন নিবে গেল তার। কিন্তু তা ক্ষণিকের জন্যে। নামজাদা বাইজি অলকা। অলক দুলিয়ে মুচকি হেসে আবার সুরু করে' দিলে—"তেরি নজরিয়া—"

বিয়ে বাড়ি।

বাড়ির বড়বউ সুষমার একমুহূর্ত্ত অবসর নেই। রান্নার সমস্ত ভার তার উপর। আড়ময়লা কাপড়ে হলুদের ছোপ লেগেছে, চুলগুলোও বাঁধা হয় নি ভাল করে। উনুন কামাই যাচ্ছে—দ্রুতবেগে তরকারী কুটছে সে কোলের ছেলেটা কোল পায় নি সমস্ত দিন, কাছে বসে' ঘ্যান ঘ্যান করছে। মাছও কোটা হয় নি এখনও।

"ও ঝি, মাছগুলো কুটে দে না। মা—কখন যে কি হবে—"

সুষমার দশ বছরের মেয়ে পুঁটি ছুটে এল উর্দ্ধশ্বাসে। উদ্ভাসিত মুখ তার।

"ও মা—মোটর এসে গেছে। আমাদের শোবার ঘরের জানালা দিয়ে সব দেখা যাচ্ছে। দেখবে? এস না!"

সুষমা তরকারি ফেলে রেখে ছুটল।

তার শোবার ঘরে অনেকেই এসে জুটেছে। যমুনা, মিনু, পদি, রুবি—আরও অনেকে। জানালা দিয়ে আসরটা বেশ দেখা যায়। আসরে লোকে লোকারণ্য। ওই যে নামছে মোটর থেকে। বাঃ কি সুন্দর! রং কালো, কিন্তু কি অপূর্ব্ব মুখশ্রী। শাড়িটা কি চমৎকার, কি মানিয়েছে! ওমা, শ্বশুর নিজে এগিয়ে গিয়ে অভ্যর্থনা করছেন। ভট্চায্যিমশায় নমস্কার করলেন হাত তুলে সসম্ভ্রমে! করবে না? কত গুণ ওর। আসরের অনেকেই উঠে দাঁড়াল। কেউ ত্রস্ত, কেউ বিস্মিত, কেউ মুগ্ধ। মহিমার দ্যুতি বিকিরণ করে' অলকা দেবী আসরে প্রবেশ করলেন।

অবাক হয়ে চেয়ে রইল সুষমা।

যমুনা বললে—"আমরাও ওরই মতো মেয়েমানুষ, কিন্তু কত তফাৎ দেখ দিকি। দাসীবৃত্তি করতে করতেই জীবন কাটল আমাদের।

"পোড়া কপাল আর কি!"—রুবি বললে।

সুষমার মনে পড়ছিল নিজের কৈশোর জীবনের কথা। তার বাবাও ওস্তাদ রেখে গান শিখিয়েছিলেন তাকে। খুব ভাল গান শিখেছিল সে। কত প্রশংসা করত সবাই তার গানের।···সভায় সমিতিতে সর্ব্বত্র গান গেয়ে বেড়িয়েছে সে বিয়ের আগে। বাজনাও শিখেছিল কত রকমের। সেতার, এস্রাজ, বেহালা, ব্যাঞ্জো······জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট বাজনা শুনে মেডেল দিয়েছিলেন একবার। ফুলের মতো ফুটে ফুলেরই মতই ঝরে' গেল জীবনের সে দিনগুলো!···কোথায় গেল?···

হঠাৎ সমস্ত শরীরে বিদ্যুৎ শিহরণ জাগল যেন তার। অলকা দেবী গান ধরেছে। ঠাকুরপো'র বিয়েতে একে এনে খুব ভাল হয়েছে। কি চমৎকার গলা। স্বপ্নলোকে উড়ে গেল সে যেন সহসা।···

"ও বৌমা, উনুনের আঁচ যে বয়ে গেল। কি করছ তুমি এখানে?"

শাশুড়ি প্রবেশ করলেন।

"এই যে যাই।"

সুগৃহিণী সুষমা মৃদু হেসে বেরিয়ে গেল।

কেন

ছেলে হয় আর মরে।

ডাক্তার কবিরাজ সবাই হার মানলেন।

চতুর্থ শিশুর মৃত্যুর পর বাপ মা লক্ষ্য করলেন যে প্রত্যেকের চেহারা প্রায় একরকম। একটি শিশুই যেন বার বার আসছে আর চলে যাচ্ছে।

কেন ? কি চায় ও ? যত্ন হচ্ছে না ?

পঞ্চম শিশু যখন হল তখন আঁতুড় ঘরেই সৌখিন জামা, নূতন বিছানা দিয়ে অভ্যর্থনা করা হ'ল তাকে।

বাঁচল না।

অনেকে বললেন ব্রাহ্মণ ভোজন করালে ফল হবে ?

ষষ্ঠ শিশুর জন্মদিনে ধুমধাম করেব্রাহ্মণকে খাওয়ানো হল। এমন কি রোশনচৌকি পর্য্যন্ত বাজল।

বাঁচল না।

অজ্ঞাত কোন পাপ আছে না কি সঞ্চিত ?

সপ্তম শিশুর জন্মের পর প্রায়শ্চিত্ত করানো হ'ল যথাবিধি।

তবু বাঁচল না।

ঠিক একই রকম চেহারার শিশু কখনও ছেলে হয়ে কখনও মেয়ে হয়ে আসছে আর চলে যাচ্ছে।

মায়ের চোখের জল শুকোয় না।

বাপ যাকে পায় প্রশ্ন করে—কেন ?

অষ্টম সন্তান হয়ে গেল, বাপ বললে—ওকে এবার শাস্তি দিয়ে দেব, আর যেন না আসে। আর পারি না আমরা—

মরা শিশুর হাতের এবং পায়ের সব আঙ্গুলগুলো মুড়িয়ে কেটে দিলেন। নবম শিশু গর্ভে এল তবু। যথা সময়ে ভূমিষ্ঠও হ'ল। একটি কন্যা। মুখ অবয়ব সেই একরকম, কিন্তু হাতে পায়ে একটি আঙ্গুল নেই। এ ম'ল না।

এখনও বেঁচে আছে।

কেন ?

়হধাম্মণী

ীরেন্দ্রবাবু বিখ্যাত শিকারী।

তাঁহার বন্দুকের গুলিতে কত প্রাণী যে নিহত ইয়াছে তাহার আর ইয়ত্তা নাই। তিনি যে সত্যই কারে সিদ্ধহস্ত তাহা বহু পাখী, শূয়ার, সাপ, বাঘ, ালুক, শিয়াল, সজারু, খরগোস, হরিণ, কুমীর, নুমান প্রাণ দিয়া প্রমাণ করিয়াছে। সকলেই তারিফ রিত। শুধু ঝোঁক নয়—বাল্যকাল হইতে এ বিষয়ে ়যোগও পাইয়াছিলেন তিনি প্রচুর। শিকার-দক্ষতা াভ করিতে হইলে শুধু ঝোঁক থাকিলেই হয় না—অর্থ এবং অবসর চাই। ধনীর দুলাল বীরেন্দ্রনাথের তাহা ছিল। এসব ছাড়া তাঁহার যোগ্যতাও ছিল। বীরেন্দ্র শুধু যে সাহসী ছিলেন তাহা নয়—সমর্থও ছিলেন। তাঁহার দীর্ঘ সুগঠিত দেহে অসুরের মত শক্তি ছিল।

বীরেন্দ্রবাবু কিছুকাল পূর্ব্বে বিবাহ করিয়াছিলেন। পিতামাতা বহু পূর্ব্বেই ইহলোক ত্যাগ করাতে বীরেন্দ্র-াবুকে নিজেই সব করিতে হইয়াছিল। শতাধিক

পাত্রী দেখার পর বীরেন্দ্রবাবু মিনতিকেই পছন্দ করিলেন। কেন করিলেন তাহা বলা শক্ত। প্রথমত মিনতি গরীবের মেয়ে—দ্বিতীয়ত অতিশয় রোগা এবং তৃতীয়ত অত্যন্ত ভীরু। ভয়চকিত চঞ্চল চক্ষু দুইটি সম্ভবত তাহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল।

বিবাহের পর তিন মাস কাটিয়াছে।

সাঁওতাল পরগণার এক পাহাড়ি জঙ্গলে বীরেন্দ্র-বাবুরই জমিদারী। প্রচুর শিকার পাওয়া যায়। একটা প্রকাণ্ড জঙ্গলের প্রান্ত দেশে সম্প্রতি এই ক্ষুদ্র দ্বিতল বাড়িটী নির্ম্মাণ করাইয়াছেন—শিকারের সুবিধার জন্যই। শিকারেরজন্য প্রায়ই তাঁহাকে এখানে অসিতে হয়। নানারকম শিকার পাওয়া যায় এই জঙ্গলে। বিবাহের কিঁছুদিন পূর্ব্বে তিনি এই জঙ্গলে প্রকাণ্ড একটা ময়াল সাপ মারিয়াছিলেন।

গভীর রাত্রি নয়—সন্ধ্যার একটু পরেই।

ইতিমধ্যেই কিন্তু চতুর্দ্দিক ঝিল্লী-ধ্বনিতে স্পন্দিত হইয়া উঠিতেছে। বাড়ীর ঠিক পিছনেই বড় একটা তেঁতুল

গাছ। তাহাতে অসংখ্য বকের বাসা। তাহাদের কলরব ও পক্ষবিধূনন বন্য অন্ধকারকে বিঘ্নিত করিতেছে। চতুর্দ্দিকে কেমন যেন থম্‌থমে্‌ ভাব।

দূরে একটা ফেউ ডাকিয়া উঠিল।

মিনতির কেমন যেন ভয় করিতে লাগিল।

শিকারীর-বেশে সজ্জিত বীরেন্দ্রকে সে কম্পিতকণ্ঠে বলিল—ওগো তুমি যেও না—আমার বড় ভয় ভয় করছে!

কোমরের বেল্‌ট্‌টা ভাল করিয়া বাঁধিতে বাঁধিতে সহাস্যমুখে বীরেন্দ্র বলিলেন—পাগল না কি! মাচান বাঁধা হয়ে গেছে, 'কিল' হয়ে গেছে—না গেলে কি চলে?

—'কিল' কি?

—'কিল' মানে একটা মোষের বাচ্চাকে বেঁধে রাখা হয়েছিল—কাল রাত্রে বাঘে সেটাকে মেরেছে। তারই কাছাকাছি একটা উঁচু মাচা তৈরী করিয়েছি—বাঘটা আজও ঠিক আসবে সেখানে।

বেল্‌ট্‌টাকে ভাল করিয়া কসিয়া লইয়া একটু মৃদু হাস্য করিয়া আবার বলিলেন—যদি আসে ফিরে যেতে হবে না বাছাধনকে আজ।

—আমার বড্ড ভয় করছে।

—ভয় কি ? ফাগুয়া ত রইলো ।

—লক্ষ্মীটি, তুমি যেও না !

—পাগল নাকি !

কিছুক্ষণ উভয়েই নীরব ।

মিনতি বলিল—আচ্ছা, আজ বিকেলে গরুর গাড়ী করে কি একটা পার্শেল এল। আমাকে দেখতে দিলে না কেন ? লুকিয়ে রেখেছ কেন বল না ?

হাসি চাপিয়া বীরেন্দ্র বলিলেন—রাত্রে নয়—কাল সকালে দেখো ।

বীরেন্দ্র চলিয়া গিয়াছেন ।

মিনতি একা বিছানায় শুইয়া এ-পাশ ও-পাশ করিতেছে। তাহার চোখে ঘুম নাই। একটু তন্দ্রার মত আসিয়াছিল—একটা নিদারুণ দুঃস্বপ্ন দেখিয়া তাহা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কি ভীষণ স্বপ্ন !—একটা বাঘ দুই থাবা দিয়া তাহার বুক চিরিয়া রক্তপান করিতেছে যেন !······অনেকক্ষণ এ-পাশ ও-পাশ করিয়া মিনতি শেষে উঠিয়া বসিল। উৎকর্ণ হইয়া খানিকক্ষণ

কি যেন শুনিল। ও কি বকের শব্দ? কক্‌খনো নয়। ভারি মোটা গলায় কে যেন গাছের উপর বসিয়া কথা বলিতেছে। উঃ, এই দারুণ রাত্রি কতক্ষণে প্রভাত হইবে। সহসা তাহার মনে হইল আজ বিকালে কি পার্শেলটা আসিয়াছে দেখা যাক্। তবু খানিকটা সময় কাটিবে। পার্শেলটা উপরের ঘরে আছে। লণ্ঠনটা লইয়া ধীর পদসঞ্চারে মিনতি বাহির হইয়া গেল।

বীরেন্দ্র যখন বাসায় আসিয়া পৌছিলেন তখন সবে ভোর হইয়াছে।

দেখিলেন চাকরদের ঘরে ফাগুয়া অঘোরে ঘুমাইতেছে গোলমালে তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল। সে উঠিয়া বসিল।

—মাইজি রাত্রে ভয়-টয় পায় নি ত রে?

ফাগুয়া বলিল যে বাবু চলিয়া যাইবার পরই মাইজি সেই যে ঘরে খিল দিয়াছিলেন আর খোলেন নাই।

বীরেন্দ্র আগাইয়া গিয়া বদ্ধ দ্বারে করাঘাত করিলেন।

কোন শব্দ নাই।

আরও কয়েকবার করিলেন।

এ বারও কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

অধীর হইয়া শেষে তিনি দ্বারে পদাঘাত করিতে লাগিলেন।

তথাপি দ্বার খুলিল না।

শেষে কপাট ভাঙিতে হইল।

ভিতরে ঢুকিয়াই প্রথমেই বীরেন্দ্রের চোখে পড়িল খানিকটা রক্ত গড়াইয়া আসিয়া দ্বারের কাছে জমিয়া রহিয়াছে।

কিসের রক্ত? মিনতি কোথায়?

বেশী খুঁজিতে হইল না—সিঁড়ির নীচেই তাহার মৃতদেহটা পড়িয়াছিল। একটু ঝুঁকিয়া বীরেন্দ্র দেখিল—মাথা ফাটিয়া গিয়াছে। নাক দিয়া রক্ত বাহির হইয়া সমস্ত মেঝেটা ভিজিয়া গিয়াছে। চাপ চাপ রক্ত! সিঁড়ি দিয়া তাড়াতাড়ি উপরে উঠিয়া বীরেন্দ্র দেখিলেন কলিকাতা হইতে আগত stuffed ময়াল সাপটা কোণে কুণ্ডলীকৃত হইয়া রহিয়াছে। মিনতিকে সকালে ভয় খাওয়াইয়া মজা

দেখিবে বলিয়া কথাটা তাহার কাছে বীরেন্দ্র গোপন রাখিয়াছিলেন।

কে বলিবে সাপটা জীবন্ত নয়; উহার ভিতরে খড় আর তুলা-ভরা আছে তাহা বলিয়া না দিলে বোঝা অসম্ভব। কাল রাত্রে এই সাপটাকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি পলাইতে গিয়া মিনতি সিঁড়ি হইতে পড়িয়া গিয়াছে। এ দৃশ্য দেখিবে সে কল্পনাও করে নাই। বীরেন্দ্র ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সাপটার দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাহার নকল চক্ষু দুইটি হইতে একটা হিংস্র দীপ্তি ফুটিয়া বাহির হইতেছে যেন! কিছু দিন পূর্ব্বে এই সাপটাকেই তিনি জঙ্গলে মারিয়াছিলেন।

বীরেন্দ্রের শিকার অভিযান ব্যর্থ হয় নাই।

কিছুক্ষণ পরেই বীরেন্দ্রের অনুচরবর্গ হিংস্র শ্বাপদটার মৃতদেহ গরুর গাড়ীতে বোঝাই করিয়া লইয়া আসিল।

প্রকাণ্ড একটা বাঘিনী।

বীরেন্দ্রের অব্যর্থ লক্ষ্য তাহার মস্তক বিচূর্ণিত করিয়াছে। বীরেন্দ্রের সহসা মনে হইল বাঘটা কোথায়!

ছাত্র

কাঠফাটা রোদ, চতুর্দ্দিকে অগ্নি-বর্ষণ করিতেছে। আমার কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নাই। আমার সমস্যা দেড় শত অঙ্ক এবং এক শত পৃষ্ঠা হাতের লেখা। গ্রীষ্মাবকাশের হোম-টাস্ক। থার্ড মাস্টারের রুদ্রমূর্ত্তি, রুদ্রতর ভাষণ এবং রুদ্রতম বেত্রাঘাতের কথা ছাড়া অন্য কিছু ভাবিবার অবসর নাই। আমি তাঁহার প্রিয়তম ছাত্র বলিয়া আরও বেশি ভাবনা। সুতরাং নিদারুণ গ্রীষ্মকে উপেক্ষা করিয়া গৌরীশঙ্কর খুলিয়া বসিয়া আছি। হঠাৎ দ্বার ঠেলিয়া থার্ড মাস্টারই প্রবেশ করিলেন। তাঁহার চেহারা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেলাম, একটু ভয়ও হইল। শুষ্ক মুখ, মাথার রুক্ষ চুলগুলা খাড়া হইয়া আছে, কোটরগত চক্ষু দুইটি জ্বলন্ত অঙ্গারের মত রক্তবর্ণ। ভাবিলাম, কুঁজো হইয়া বসিয়াছি বলিয়া হয়তো ধমক দিবেন। তাড়াতাড়ি সোজা হইয়া বসিলাম। কিন্তু সেসব কিছু না করিয়া

তিনি অনুনয়পূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন, "এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল খাওয়াতে পারিস বাবা।"

ঘরের কোণে কুঁজায় জল ছিল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া এক গ্লাস আনিয়া দিলাম। ঢক ঢক করিয়া নিমেষে তাহা নিঃশেষ করিয়া ফেলিলেন।

"আর এক গ্লাস।"

দিলাম।

তাহাও নিমেষে শেষ হইয়া গেল।

"আর এক গ্লাস চাই। আঃ, বাঁচালি বাবা, তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে, এক ফোঁটা ঠাণ্ডা জল পাবার উপায় নেই কোথাও—।"

ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।

স্বপ্ন।

বাস্তব কিন্তু আরও নিদারুণ।

পরদিন প্রখর রৌদ্র ও গেঁটে বাতকে উপেক্ষা করিয়া প্রৌঢ় আমি উত্তপ্ত বালির চড়া ভাঙ্গিয়া তিন ক্রোশ দূরবর্ত্তী গঙ্গা অভিমুখে চলিয়াছি। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে স্কুলে যে থার্ড মাস্টারের নিকট পড়িয়াছিলাম, যিনি আজ প্রায় বিশ বৎসর পূর্ব্বে

অপুত্রক অবস্থায় মারা গিয়াছেন—কাল সহসা তাঁহাকে স্বপ্ন দেখিয়া আমি—আপনারা যাহা বলিবেন তাহা আমি জানি, ফ্রয়েড চার্ব্বাক আমিও পড়িয়াছি—নিজের অযৌক্তিক আচরণে নিজেই বিস্মিত হইতেছি, কিন্তু কি করিব, উপায় নাই—ঘাড়ে ধরিয়া কে যেন আমাকে লইয়া যাইতেছে।

তর্পণ আমাকে করিতেই হইবে।

রূপকথা

শিল্পীর স্বপ্ন ভাঙ্গিয়াছে।

জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তের সাধনা—এই মর্ম্মর মূর্ত্তি! কত দিবসের, কত নিশীথের আকাঙ্ক্ষিত মূর্ত্ত স্বপ্ন—সহসা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল। হতবাক্ শিল্পী নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া আছে—যে মর্ম্মর-প্রতিমাটি এত যত্নে সে গড়িয়া তুলিয়াছিল তাহা সহসা পাষাণস্তূপে পরিণত হইয়াছে। প্রতিমা অন্তর্হিত হইয়াছে, যাহা পড়িয়া আছে—তাহা পাষাণ। হঠাৎ ভাঙিয়া গেল!

কেন এমন হইল? কে বলিবে? শিল্পীর সাধনা, শিল্পীর স্বপ্ন কখন কোন মন্ত্রবলে নিঃশেষ হইয়া যায় কে তাহার সন্ধান দিবে?

দিবারাত্রির অক্লান্ত পরিশ্রমের পর যেই তাহার স্বপ্ন মূর্ত্তি-পরিগ্রহ করিল, কঠিন পাষাণ যে মুহূর্ত্তে তাহার মানসীতে রূপান্তরিত হইল—যে মুহূর্ত্তে সে তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল—"যাক্, এতদিনে পরিশ্রম সার্থক হইল"—সঙ্গে সঙ্গে সব শেষ! মানসীর মৃত্যু! ইহাকে কি সে আর ফিরিয়া পাইবে?

প্রতিমা ফাটিয়া গেল—যাহা রহিল তাহা বিদীর্ণ শিলাখণ্ড। মুহ্যমান শিল্পী নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিল।

অনুজা ও অভিজিৎ আসিয়া দেখে, শিল্পী তেমনি-ভাবেই বসিয়া আছে। অনুজা শিল্পীর বিধবা দিদি। এই পাগল ভাইটিকে সে জননী-স্নেহে লালন করিয়াছে। সে খাইতে দিলে শিল্পীর খাওয়া হয়—তাহারই অনুরোধে যেন সে বাঁচিয়া আছে।

অভিজিৎ শিল্পীর প্রতিবেশী ও অনুজার প্রণয়ী। তাহাদের দেখিয়া অসহায়ের মত শিল্পী বলিয়া উঠিল—

"দেখ দিদি—দেখ অভিজিৎ—এ কি হয়েছে।"

অনুজা কিছু বলিল না।

অভিজিৎ বলিল—"তোমার মুক্তি হয়েছে। রাজ-শিল্পী তুমি, রাজসভায় যাও।"

…শিল্পী ধীরে ধীরে উঠিয়া বাহিরে গেল।

তাহার মানসীর স্মৃতি তাহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া গেল—রাজসভায় নয়, শ্মশানে।

মহাশ্মশান…

কাছে, দূরে চিতা জ্বলিতেছে। অন্ধকার ভেদ করিয়া যতদূর দৃষ্টি যায়—চিতা—কেবল চিতা! নর, নারীর, দেশের, জাতীর, হৃদয়ের! কাহারও অনলশিখা গগনস্পর্শী—কেহ নির্বাপিতপ্রায়—কেহ নিবিয়া গিয়াছে। চিতাভস্ম লইয়া বাতাস উন্মাদ!

…অন্ধকারে মৃদু কলকলধ্বনি!…বৈতরণীর। সেই প্রায়ান্ধকার শ্মশানে শিল্পী ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এই মহাশ্মশানে তাহার মানসীর সন্ধান মিলিবে কি? মানসী কি মরিয়াছে…তাহাই বা কে বলিয়া দিবে। মানসী

কি মরে? মরিলেও কি তাহার সন্ধান পাওয়া যায়? অন্ধকার উত্তর দেয় না শ্মশানের চিতা জ্বলে ও নেবে। সহসা শ্মশানভূমি অট্টহাস্যে শিহরিয়া উঠিল। সচকিত শিল্পী চিতার আলোকে দেখিল, হাসিতে হাসিতে একটী মূর্ত্তি তাহার দিকে অগ্রসর হইতেছে। তাহার মুখাবয়ব জটা-শ্মশ্রু-মণ্ডিত—চক্ষু-দুইটী জ্বলন্ত অঙ্গারের ন্যায়—মুখে বিকট হাস্য! কণ্ঠে পুষ্পমাল্য —পুষ্পমাল্যকে বেষ্টন করিয়া এক বিষধর সর্প পিচ্ছিল সঞ্চরণে সর্ব্বাঙ্গ আকুঞ্চিত করিতেছে। তাহার এক হস্তে খর্পর—অন্য হস্তে বাঁশরি!—সম্পূর্ণ উলঙ্গ! শিল্পীর নিকটে আসিবামাত্র সে অট্টহাস্যে চতুর্দ্দিক প্রকম্পিত করিয়া উন্মাদ-নৃত্য জুড়িয়া দিল—সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত গান—

দুটো গরুর চারটে পা রে
তিনটে পা তার খোঁড়া,
টিয়ে পাখীর ডিমের মাঝে
ছিল টাট্টু ঘোড়া
আকাশ থেকে চাঁদকে পেড়ে
ভাতে দিলাম সেদিন,

নামিয়ে দেখি শূয়ারমুখো
গিরগিটি দু জোড়া।
শুঁয়ো পোকার সঙ্গে যেদিন
বিয়ে হল রাণীর,
তাই না দেখে মাকড়শাটার
পৃষ্ঠে হল ফোড়া—
হা-হা-হা-হা—

শিল্পী সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি কে?"

"আমি? দেখদিকি ভাল করে?—চিনতে পারছ না?"

"না।"

"হা হা হা হা"—উন্মাদের হাসি।

চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া শিল্পী শুনিল—সে বলিতেছে—"আমি যে তুমি। তোমারই আর একটা রূপ আমি।"

"বুঝতে পারলাম না।"

"হা—হা—হা—হা"—আবার সেই অট্টহাস্য!

হাসি থামাইয়া হঠাৎ সে আবার বলিল—"তিনের পিঠে একটু কিছু দিলে একটা সংখ্যা হয় আর ঘোড়ার পিঠে একটা কিছু দিলে জিন্ হয়! কেমন মজা!

তোমার নাম কি বন্ধু?—যদিও আমি জানি,—তবু তোমার মুখে একবার শুনতে ইচ্ছে করছে—"

"আমার নাম চিত্রকারু। আমি শিল্পী—"

"আর বলতে হবে না। তুমি শিল্পী? আমি যদি বলি, তুমি স্বপ্ন!—মিছে কথা হয় তাহলে?—হা হা হা হা"—শিল্পী অভিভূত হইয়া দেখিতে লাগিল, আবার সে নৃত্য জুড়িয়াছে। বাঁশরীর আঘাতে হাতের খর্পরটা যেন হাসিতেছে। তাহার কণ্ঠের বিষধর সর্পের চক্ষে কুসুমের কোমলতা ফুটিয়া উঠিল— পুষ্পমাল্যের এক একটি ফুল যেন স্ফুলিঙ্গ।

হঠাৎ সে আবার নৃত্যগীত বন্ধ করিয়া দিল।

শিল্পীকে জিজ্ঞাসা করিল—"ফুটবল খেলছিস্ কখনও? আকাশে গিয়ে? সূর্য্য চন্দ্রকে ফুটবল করে? আচ্ছা আর একটু বড় হ—তারপর খেলবি।"

অপরিসীম করুণায় সে শিল্পীর গায়ে-মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল। জ্বলন্ত অঙ্গারের মত চক্ষু-দুইটি হইতে স্নেহ ক্ষরিয়া ক্ষরিয়া পড়িতেছে।

শিল্পী আবার জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি কে? আপনার নাম কি?"

"আমার নাম 'যা-ইচ্ছে'—"

"যা-ইচ্ছে ?"

"হ্যাঁ—সকলের সঙ্গেই ত আমার আলাপ! তোর কাছেও ত জন্মাবধি আছি। তোর মানসীর চোখের মাঝখানে এতদিন বসেছিলাম, তুই ত বাটালির ঘায়ে আমাকেই অস্থির করে দিয়েছিস্ রোজ—এই দেখ—হা-হা-হা।"

শিল্পীর ভাষা হারাইয়া গিয়াছে। শিল্পী দেখিল, সত্যই ত ইহার সর্ব্বাঙ্গে ক্ষতচিহ্ন! কে এ?

"আমার মানসীর চোখের ভিতর আপনি ছিলেন?"

আবার পাগল নাচিতে আরম্ভ করিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে গান—

ভাবের যখন হয় রে অভাব
ভাষা তখন আসর জমায়
নফর যখন হয় রে নবাব
উজীরের সে মাইনে কমায়।
কান এবং নাকে মিলে
কান্নাকে যে জন্ম দিলে
চমকে গেল হায়রে পিলে
চোখের জ্যোতি বাড়ল অমায়।
উজীরের সে মাইনে কমায়—

সে থামিলে শিল্পী আবার জিজ্ঞাসা করিল,—"আমার কথা শুনুন। আপনি কি আমার মানসীকে চেনেন?"।

পাগল হাসিয়া বলিল—"আমি তোমাকে চিনি। তুমি এখানে এসেছ কেন বল ত। যদিও আমি জানি, তবু তোমার মুখে শুনতে বেশ লাগে—হা-হা-হা—"

"আমার মানসীর স্মৃতি আমাকে এখানে টেনে এনেছে।"

"হা-হা-হা—মানসীর স্মৃতি! শ্যামা-নাপতিনির নাতনি মারা গেছে—রামময়ের ভাই মরে গেল—চিতা নেবেনি এখনও। তাদের স্মৃতি বুঝি তোমায় আকুল করছে না? কেবল মানসীর স্মৃতি নিয়ে তুমি ব্যস্ত! কেন বাছাধন?

"তাকে যে আমি ভালবাসতাম—"

"আর এদের বাসতে না কেন? আম, অাঙুর, আচার এবং মাংস এবং আরো অনেক কিছু ত তুমি ভালবাস একসঙ্গে। মানসীকে ভালবাসবে আর রামময়ের ভাইকে বাসবে না কেন?"

"বলিয়াই উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই সে আবার গান ধরিয়া দিল—

জলের মাঝে পড়লে চিনি
গলেই জেনো যাবে দাদা,
গরম দুধে পাঁউরুটি সে
নিমেষ মাঝে হবে কাদা।
ডাগর চোখে সাগর আছে,
চাউনিতে তার ডাইনি নাচে;
ভূত থাকে যে সেওড়া গাছে
পরনে তার কাপড় সাদা—
গরম দুধে পাঁউরুটী সে
নিমেষ মাঝে হয় যে কাদা।

হঠাৎ সে থামিয়া গেল। বলিল "এইবার আমাকে সরে পড়তে হবে। আমার গানের মানে ক্রমশঃ বোঝা যাচ্ছে!

শিল্পী কহিল—"না, না, আপনি বলে যান—আমার মানসী কোথায়? আপনি ত চেনেন তাকে? সে কোথায়?" "পাগল বলিল—"তাকে তুমিই ত মেরে ফেল্লে! দিন রাত উঠে পড়ে লেগে শেষ করে দিলে। অমনি সে মরে গেল।"

"আর পাব না তাকে?"

"আবার পাবে বৈ কি। আনন্দের দেশে যাও।"

"কোথায় সে দেশ ?

খুঁজে বার কর।" তাহার পর কি ভাবিয়া বলিল—"আচ্ছা এই মালাটা গলায় পর। আনন্দের দেশের আভাস একটা পাবে। এ মালা কিন্তু বেশীক্ষণ থাকবে না—একটু পরে পাখী হয়ে যাবে। তার পরে হাওয়া—"

মালাটি শিল্পীর গলায় পরাইয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে নাচিতে নাচিতে সেই অদ্ভুত মূর্ত্তি শ্মশানের অন্ধকারে মিলাইয়া গেল !

শ্মশান-দেবতার বরমাল্য গলায় পরিয়া শিল্পী আনন্দের দেশের স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। তন্ময় হইয়া গেল। কি অদ্ভুত দেশ !

"ওই দেশে যেতে হলে জ্ঞানরাজ্যে যাও আগে—"

চমকিয়া শিল্পী দেখিল গলার মালা পাখী হইয়া গিয়াছে। উড়িয়া উড়িয়া বলিতেছে—"এস আমার সঙ্গে—"

অনুজা চলিয়াছে।

চলিয়াছে তাহার ভায়ের সন্ধানে। পাগলের মত

কোথায় চলিয়া গেল সে? তাহার সেই অসহায় ভাই! না খাইতে দিলে সময় মত খায় না, বিছানা করিয়া না দিলে যেখানে-সেখানে ঘুমাইয়া পড়ে! পরিষ্কার পরিচ্ছদ জোর করিয়া হাতে তুলিয়া না দিলে সে বেশ-বাস বদলায় না! এখনও শিশু। সন্তানহারা জননীর আকুলতায় অনুজা পথের শ্রান্তি ভুলিয়াছে।

...সহযাত্রী অভিজিৎ। অভিজিৎ খুঁজিতেছে শিল্পীকে নয়, অনুজাকে। অনুজা তাহার পথ-চলার সঙ্গিনী। পাশাপাশি চলিয়াছে—অথচ আজও সে অনুজার সন্ধান পায় নাই।

.

দিন যায়—রাত্রি আসে। কত ফুল ফুটিল, ঝরিল। কত চন্দ্র-সূর্য্য উঠিল, ডুবিল। পথের শেষ নাই—দুই জনে পাশাপাশি চলিয়াছে।

জ্ঞান-রাজ্য বহুদূর।

শিল্পী জ্ঞান-রাজ্যে আসিয়াছে।

অসীম এই দেশ। যতদূর দেখা যায় সীমা-রেখা

চোখে পড়ে না। এই দেশে কোথাও অভ্রভেদী পর্ব্বতমালা—আকাশের সঙ্গে মিতালি করিতেছে। কোথাও মরীচিকাময় মরুভূমি—কোথাও উর্ম্মিসমাকীর্ণ মহাসমুদ্র—কোথাও আবার মনোহর পুষ্করিণী, পদ্মফুলে ভরা। এই দেশের কোথাও কণ্টকময়, কোথাও পুষ্পাকীর্ণ, কোথাও উষর, কোথাও শ্যামল। চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ, ভিড় নাই। একটি বৃক্ষতলে শিল্পী একরাশি জটিল সূতার বাণ্ডিল লইয়া তাহার জট্ ছড়াইবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু কিছুতেই পারিতেছে না—তাহার হস্তপদ সেই সূতার জালে যেন জড়ীভূত হইয়া যাইতেছে—বুদ্ধি বিভ্রান্ত হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু শিল্পীর চেষ্টার বিরাম নাই। চতুর্দ্দিক প্রখর সূর্য্যালোকে উদ্ভাসিত। কিন্তু এই সূর্য্যালোক শিল্পীকে মুগ্ধ করিতেছে না। শিল্পী সূত্র-সমস্যায় মগ্ন। …দূরে সিদ্ধান্ত-শেখর প্রবেশ করিলেন। ইনি একজন মহাজ্ঞানী। আপনার মনে সূতার জট্ ছাড়াইতে ছাড়াইতে আসিতেছেন—তাঁহার গাত্রে, হস্তে, মস্তকে নানা বর্ণের সূতার জাল। তিনি সূতার জট্ ছাড়াইতে ছাড়াইতে শিল্পীর সমীপবর্ত্তী হইলেন। শিল্পী সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইতেই সিদ্ধান্ত-শেখর স্মিতমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"আপনি কে? কতদিন এ দেশে এসেছেন? ইতিপূর্ব্বে আপনাকে দেখেছি বলে ত মনে পড়ছে না!—"

শিল্পী বলিলেন—"আমি আনন্দের দেশের সন্ধানে যাত্রা করেছিলাম। শুনেছি আনন্দের দেশের সন্ধান জ্ঞানরাজ্যে পাওয়া যায়। এখানে এসে আমি আচার্য্য উদ্দীপনের উপদেশ প্রার্থনা করি। তিনি আমায় বললেন, এই যে রাশি রাশি জটিল সূত্র—এদের সমস্যা—এদের জটিলতা যে সমাধান করতে পারবে সেই আনন্দের দেশে যেতে পারবে। আমি তাই তাঁর উপদেশ অনুসারে এই জট্ ছাড়াবার চেষ্টা করছি। কত দিন লাগবে বলতে পারেন?"

সিদ্ধান্ত-শেখরের সমস্ত মুখ হাসিতে ভরিয়া গেল। তিনি বলিলেন—"তার কি ঠিক আছে? সে ব্যক্তিগত যোগ্যতার উপর নির্ভর করে। আমার ত বহুবৎসর অতীত হয়ে গেছে—এখনও ত সব বাকী, অধীর হয়ো না। ওই সাদা সূতার জট্ খুলতেই তুমি অধীর হয়ে পড়েছ—এর পর লাল, কালো, নীল, সবুজ, হলুদ—বহুবর্ণের জটিল সমস্যা আছে। একে একে সব রহস্য উদ্ঘাটন করতে হবে, তবে না আনন্দের দেশের সন্ধান পাবে!"

এই বলিয়া সিদ্ধান্ত-শেখর ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন।

নিকটে দূরে সিদ্ধান্ত-শেখরের মত আরও দুই এক জনকে দেখা গেল। সকলেই সূত্র-সমস্যায় আকুল!

আর ভাল লাগছে না।

শিল্পীর ধৈর্য্য সীমা ছাড়াইয়াছে—হস্ত-পদ ক্লান্ত, অবসন্ন। চোখে ঘুম ঘিরিয়া আসিতেছে। সাদা সূতার জট্ এখনও জটিল হইয়াই আছে। আপন মনেই শিল্পী বলিয়া উঠিল, "আর ত পারি না। এর-যে কোন আদি-অন্তই খুঁজে পাচ্ছি না। অনেক কষ্টে যদি খেই খুঁজে পেলাম, একটু পরেই আবার হারিয়ে যাচ্ছে। যার জট্ ছাড়িয়ে রেখেছিলাম, খানিকক্ষণ পরে দেখি আবার তাতে নূতন করে জট্ পড়েছে। কি করা যায়? আনন্দের দেশের কোন খবরই ত পাচ্ছি না! সন্দেহের পর সন্দেহ মনে জাগছে! এই জটিলতার মধ্যে কি—"

সহসা শিল্পীর চিন্তাধারা ব্যাহত হইল। হঠাৎ একটি গান কোথা হইতে ভাসিয়া আসিল, অপূর্ব্ব কণ্ঠস্বর!

উড়ে গেল মন যে আমার
ভ্রমরের ডানায় ডানায়।…

একটি সুশ্রী কিশোরী, পিছনে লীলায়িত সবুজ ওড়না মাথায় বেণী দুলিতেছে, সর্ব্বাঙ্গে চাঞ্চল্য। হাততালি দিয়া গান গাহিতে গাহিতে সেই দিকে আসিল।

শিল্পী তাড়াতাড়ি সূতার বাণ্ডিল ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি কে?"

কিশোরী তাহার দিকে চাহিয়া একটু হাসিল মাত্র। কথার উত্তর দিল না, হাততালি দিতে দিতে নানারূপ অঙ্গভঙ্গী সহকারে সে গাহিয়া চলিল—

হঠাৎ এই সোনার আলো
নয়নে লাগ্‌লো ভালো
ভরেছে পরাণ আমার
ভরেছে রে কানায় কানায়।
উড়ে গেল মন যে আমার
ভ্রমরের ডানায় ডানায়—!

গান শেষ করিয়া কিশোরী শিল্পীর দিকে ফিরিয়া কহিল, "যখন কেউ গান করে তখন তা'কে কথা কওয়াতে নেই। এ বুঝি আপনি জানেন না? আচার্য্য উদ্দীপন তা' বুঝি আপনাকে শেখাননি!"

শিল্পী বিস্মিত-দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

একটা ঘুরপাক খাইয়া কিশোরী বলিল—"আমার নাম খেয়াল।"

শিল্পী আবার প্রশ্ন করিল—"ক্ষমা করবেন আমাকে। আপনি যে এই গান গাইলেন, এর অর্থ কি?"

"এর অর্থ আপনি বুঝতে পারবেন না। তা-ছাড়া কোন জিনিসের অর্থ নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না কখনো! গানের অর্থ যাই হোক্—আপনার এখানে বসে থাকার অর্থ কি?"

"আমি আনন্দের দেশের পথ খুঁজছি—এই জটিলতার সমাধান করতে পারলেই—"

কিশোরী হঠাৎ হাসিয়া কবিতায় উত্তর দিয়া উঠিলেন—

জটিলকে আরো জটিল করিছ
সরল তাহারে করিতে গিয়া,
প্রেম-সমস্যা সমাধান লাগি
নিত্য যেমন করিছ বিয়া।

শিল্পীর মুখে কথা যোগাইল না।

কিশোরী আবার বলিল,—"এই সব বাজে সুতোর বাণ্ডিলে আপনি আনন্দের দেশের সন্ধান পাবেন—কে বলল আপনাকে?"

"আচার্য্য উদ্দীপন।"

"আচার্য্য উদ্দীপন যে একটি বাতুল, তা আপনি শোনেন নি বুঝি? এই দেশটাই ত পাগলের দেশ। পাগল দেখতে বেশ লাগে, তাই। মাঝে মাঝে এখানে আসি। আপনি দেখছি এখনও একটু প্রকৃতিস্থ আছেন—এই বেলা পালান।"

"কোথা যাব?"

"যে দিকে দু'চক্ষু যায়—"

বলিয়া কিশোরী চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে শিল্পী বলিল, "একটু দাঁড়ান। আপনি থাকেন কোথায়?"

হাস্যকলরবে চতুর্দ্দিক মুখরিত করিয়া কিশোরী কহিল—"চিনতে পাচ্ছেন না আমাকে? আপনার মনের ভেতরই ত আমার বাসা।"

"কৈ, এর আগে কখনও ত দেখিনি আপনাকে—"

"বাঃ—সে দিন যে শ্মশানে দেখা হল রাত্রে! বা-রে বেশ!"

কিশোরী হাসিয়া লুটাইয়া পড়িতেছে।

শিল্পী নির্ব্বাক।

শিল্পী অবশেষে বলিলেন—"আপনি আজ বলছেন এখান থেকে পালাতে। সেদিন ত আপনারই দেওয়া

গলার মালা পাখী হয়ে আমাকে এ দেশে নিয়ে এল—"

"আমি আর আমার মালা—কি এক জিনিস ?"

এই বলিয়া কিশোরী সহসা অন্তর্হিত হইয়া গেল।

শিল্পীও চলিয়াছে। সুত্রের বোঝা পিছনে ফেলিয়া তাহার মন উধাও হইয়াছে—কোথায় কে জানে !

কিন্তু এ রাজ্যে আর সে থাকিবে না।

কিন্তু বড় পিপাসার্ত্ত সে !

জল কোথায় ?

জল !······ওই যে !

মরু-প্রান্তরের মরীচিকার পিছনে সে ছুটিল ;

অনুজা ও অভিজিৎ।

কত দিন' কত মাস, কত বর্ষ পথ অতিবাহন করিয়াছে। এই ত জ্ঞানরাজ্য। কই ? এখানেও ত কেহ নাই ! অনুজা আজিও তাহার ভাইকে পাইল না—অভিজিৎ অনুজার সন্ধান আজও করিতেছে। পথ-চলার শেষ নাই···কতদূর—!

সহসা অভিজিৎ কৃতার্থ হইয়া গেল।

অনুজা বলিতেছে—সে তৃষিতা, একটু জল চাই।

জল ?

ওই ত নিকটেই একটা কূপ রহিয়াছে। চতুর্দ্দিক ফুল-গাছ দিয়া ঘেরা। জল তুলিবার কোন উপকরণ কিন্তু নাই। অভিজিৎ সেই সন্ধানে অনুজাকে সেই কূপের পার্শ্বে বসাইয়া রাখিয়া চলিয়া গেল। বলিয়া গেল—"বালতি কিম্বা ঘড়া যাহোক্ একটা যোগাড় করে আনছি আমি। তুমি বোস।"

অনুজা বসিল— অভিজিৎ চলিয়া গেল।

অভিজিৎ আর আসে না। কোথায় গেল সে ?

অনুজার তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিতেছে।

সহসা অনুজা বলিয়া উঠিল—"উঃ বড় পিপাসা—আর ত পারি না। আমাকে একটু জল দেয় এমন কেউ নেই এখানে ?"

অনুজার কথা শেষ হইতে না হইতে সেই কূপের ভতর হইতে চন্দন-চর্চ্চিত পুষ্পমাল্য-বিভূষিত একটি লোক বাহির হইয়া আসিল। অনুজাকে বলিল—"সুন্দর নির্ম্মল জল যদি চান আসুন আমার সঙ্গে"।

"কোথায় যেতে হবে ?"

"এই কূপের ভিতর। কোন ভয় নেই—আসুন।"

"আমার সঙ্গী যে এখনও ফেরেননি।"

"তাহলে অপেক্ষা করুন! আমি যাই—"

"একটু জল এনে দিতে পারেন না দয়া করে'—"

"না, সে জল আনা যায় না।"

"চলুন যাই তবে—"

অনুজা চলিয়া গেল।

অভিজিৎ আসিয়া দেখে অনুজা নাই। একটু দূরে সিদ্ধান্তশেখর সূতার জট্ ছাড়াইতেছেন! অভিজিৎ তাঁহাকেই গিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"একজন রমণী এখানে ছিলেন। কোথায় গেলেন তিনি? দেখেছেন আপনি?"

সিদ্ধান্তশেখর বলিলেন—"দেখেছি। তাঁকে সহজে এখন পাবে না। তিনি ধর্ম্মকূপে প্রবেশ করেছেন।"

"ধর্ম্মকূপ? সে আবার কি?"

"ওই যে আপনার সম্মুখেই রয়েছে। ওখানে কোন সরল অসহায় বিশ্বাসপ্রবণ প্রাণ যদি গিয়ে তৃষ্ণার জল চায় তাহলে ধর্ম্মকূপের অভ্যন্তর-বাসী কেউ এসে নির্ম্মল জলের প্রলোভন দেখিয়ে তাকে ওর ভিতরে নিয়ে যায়। একটি স্ত্রীলোককে এক্ষুনি নিয়ে গেছে আমি দেখেছি।"

অভি। আপনি দেখ্‌লেন অথচ বারণ করলেন না?

সিদ্ধান্তশেখর। বারণ করে কোন ফল হয় না বরং উল্টো ফল হয়। আমি আমার অনেক বন্ধু-বান্ধবকে ওই ধর্ম্মকূপে পতিত হতে দেখেছি। এই জ্ঞান-রাজ্যের মধ্যে কয়েকটি ওই রকম ধর্ম্ম-কূপ আছে। একবার যদি ওর প্রতি কোন মোহ জন্মায় তাহলে আর নিস্তার নাই। জ্ঞান-রাজ্যে সে আর ফিরে আসতে পারবে না।

অভি। আপনি এতে পড়েন না কেন?

সি। আমি যে নাস্তিক।

অভি। আমি কি প্রবেশ করতে পারব?

সি। তৃষ্ণার জল প্রার্থনা করুন। আপনাকে যদি যোগ্যপাত্র বিবেচনা করেন—ওঁরা নিজেরাই এসে সমাদরে আপনাকে নিয়ে যাবেন।

অভি। আমি যদি লাফিয়ে পড়ি?

সি। (হাসিয়া) তা হয় না। ওর কিছুদূর গিয়েই একটা রুদ্ধদ্বার আছে। অবিশ্বাসী নাস্তিকের পক্ষে তা চির-রুদ্ধ।

এই বলিয়া সিদ্ধান্ত-শেখর চলিয়া গেলেন।

অভিজিৎ চেষ্টার ত্রুটি করিলেন না।

তারস্বরে তৃষ্ণার জল প্রার্থনা করিলেন—কেহ আসিল না।

ভিতরে লাফাইয়া পড়িলেন—কিন্তু উঠিয়া আসিতে হইল।

সর্ব্ব-প্রকার চেষ্টা তিনি করিলেন—কিন্তু ধর্ম্মকূপ তাঁহার নিকট রুদ্ধই রহিয়া গেল।

অনুজা আর ফিরিবে না—?

সে কি!

শিল্পী,—উদ্‌ভ্রান্ত শিল্পী—চলিয়াছে।

চতুর্দ্দিকে হতাশার মরুভূমি—মৃগতৃষ্ণিকার মায়া-সরোবর রচনা করিতেছে। তৃষ্ণার্ত্ত শিল্পী তাহাদেরই উদ্দেশে ছুটিয়া চলিয়াছে। তৃষ্ণা ত মিটিল না—কিন্তু শক্তির যে শেষ হইয়া আসিল!

তপ্ত বালুকণার জ্বলন্ত অনুভূতি—ঘূর্ণীবাতাসের উন্মত্ত নর্ত্তন—মরীচিকার ছলনা!

শিল্পীর বিস্রস্ত কেশ, বিক্ষত চরণ। নয়নে তীব্র জ্বালা, বক্ষে নিদারুণ পিপাসা। বিশুষ্ক রসনায় অব্যক্ত হাহাকার—কোথায়—কোথায়—কোথায়—!

ওই যে আর একটু দূরে—ওই ত শ্যাম অরণ্যানীর স্নিগ্ধকান্তি।—জলধারার আভাস পাওয়া যাইতেছে যেন!

মরীচিকার পিছনে ছুটিতে ছুটিতে সহসা শিল্পী আর পারিল না। তাহার সংজ্ঞাহীন দেহ তপ্ত বালুকায় লুটাইয়া পড়িল।

কাছে—দূরে মরীচিকার স্বপ্ন রচনা করিতেছে। এখনও!

ধীরে ধীরে একটী মরীচিকা যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল।

...একটি মানবী মূর্ত্তি।

সুন্দরী—যুবতী—তন্বী!

ধীরে ধীরে সে শিল্পীর নিকট আসিল।

ধীরে ধীরে কহিল—"ওঠ, আমি এসেছি"—

ধর্ম্মকূপের অভ্যন্তর।...চতুর্দ্দিক বন্ধ। আলোক-প্রবেশের পথ নাই। ধূপ-ধূনার ধূমে সমাচ্ছন্ন। হোমাগ্নি জ্বলিতেছে। রাশি রাশি মৃত কিম্বা মৃতপ্রায় পুষ্পের শবদেহ। এখানে মহাধার্ম্মিক সকলেই অন্ধ।

এক একজন হাত ধরিয়া তাহাদের লইয়া বেড়াইতেছে। বিবিধ মূর্ত্তি। কাহারও শিখা—কাহারও জটা—কেহ মুণ্ডিত-মস্তক—কেহ পট্টবস্ত্র পরিহিত—কেহ উলঙ্গ—কেহ রক্তাম্বরধারী।

…সিংহবাহিনী-মূর্ত্তির পদতলে অনুজা উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে। সরলতার প্রতিমূর্ত্তি একটী নারী বসিয়া গান গাহিতেছে। তাঁহার নাম বিশ্বাস। এই গানের সুরই ধর্ম্মরাজ্যর প্রাণ-মন্ত্র!

ডাকো শুধু ডাকো—
তাঁহারি চরণে মরম-খানিরে
উজাড় করিয়া রাখো।

বেদনার বোঝা চরণের তলে
ভিজাইয়া রাখ নয়নের জলে
সকল বেদনা ঘুচিবে মুছিবে
যেও না, দাঁড়ায়ে থাকো!

বেদনার কথা লুকায়ে রেখোনা
সরমের কথা বৃথাই ঢেকোনা
কেবল তাঁহার মোহন মূরতি
ব্যথিত মরমে আঁকো!

এই একই মন্ত্রের বিবিধ ভাষা! অন্ধকারে অন্ধের প্রার্থনা। অনুজা অন্ধ হইয়াছে। প্রার্থনা করিতেছে, 'ভাইকে ফিরাইয়া দাও'—পিপাসা কিন্তু মেটে নাই। অভিজিৎ কখন জল আনিবে—মনে মনে প্রতীক্ষা করিয়া আছে।

অভিজিৎ মরুভূমিতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

অনুজার মত বিশ্বাস তাহার নাই···ধর্ম্ম-জগতে সে স্থান পাইল না। শিল্পীর মত স্বপ্ন নাই, কোন মরীচিকা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল না। সংসারের সাধারণ মানুষ সে। শিল্পী তাহার বন্ধু ছিল—তাহার পাগলামির জন্যই তাহাকে ভালবাসিত। অনুজাকে সে জীবন-সঙ্গিনী করিতে চাহিয়াছিল। পাইল না। কাহাকেও পাইল না!

হতাশার মরুভূমি ধূ ধূ করিতেছে। অভিজিৎ যখন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়—জীবনের সমস্তটা যখন বিস্বাদ হইয়া গিয়াছে তখন তাহার সহিত এক ফেরিওয়ালার দেখা হইল। নাম তার ব্যসন। অভিজিৎ তাহাকে পাইয়া যেন বাঁচিয়া গেল।

"তুমি কে ভাই ?"

"আমি একজন ফেরিওয়ালা !"

অভি। ফেরিওয়ালা ? এই মরুভূমির মাঝখানে ফেরিওয়ালা !

ব্যসন। আজ্ঞে হ্যাঁ। এইখানেই আমার সমঝদার বেশী—

অভি। কি আছে—তোমার কাছে ?

ব্যসন। নানারকম জিনিস আছে। কি চান বলুন ?

অভি। দু'একটা নাম কর দেখি—

ব্যসন। তাস, পাশা, গান, সাহিত্য, সঙ্গীত, মদ।

অভি। মদ আছে।

ব্যসন। আছে ?

অভি। দাম ত আমার কাছে এখন নেই।

ব্যসন। আমার কাছে আসতে হলে অগ্রিম দাম দিয়ে তবে আসতে হয়। তা আমি পেয়ে গেছি। জিনিসটার দাম যথা-সময়ে ও যথা-স্থানে আপনার কাছে আদায় করে নেওয়া হবে।

অভি। (সাগ্রহে) দিন তবে।

বহুকাল পরে অনুজা ও অভিজিতের দেখা হয়।

অনুজা অন্ধ—অভিজিৎ মত্ত।

কেহ কাহাকেও চিনিতে পারে নাই।

আনন্দের দেশ। চতুর্দ্দিক উজ্জ্বল। অজস্র ফুল, অজস্র হাসি—অনবদ্য সঙ্গীত—অফুরন্ত আনন্দ। তরুণ-তরুণীর হাট। বিশ্বের যৌবন এখানে অক্ষয় হইয়া আছে।

একটি নির্জ্জন চাঁপা-গাছের-তলায় বসিয়া শিল্পী মরীচিকা-সুন্দরীর কর্ণমূলে স্তুতিগান করিতেছে—"তুমি কত সুন্দর!"

শিল্পীর সেই মর্ম্মর-প্রতিমা?

তাহা এখনও ভগ্ন-বিদীর্ণ!

শ্যাম শৈবালদল আসিয়া তাহার বিদীর্ণ-স্থানটুকু ঢাকিয়া দিতেছে।

স্বপ্ন

নিদারুণ দারিদ্র্য। দুই বেলা অন্ন জোটে না, পরিধানে ছিন্ন মলিন বসন। অপরিচ্ছন্ন পল্লীতে খোলার ঘরে তবু দিন কাটিতেছিল। কিন্তু নূতন একটি সমস্যার উদয় হইয়াছে, পুঁটি আসন্নপ্রসবা। যদিও প্রথম সন্তান, তবু আনন্দ নাই। দীন-দরিদ্রের অভাব অনশনের মধ্যে কোন্ হতভাগ্য আসিতেছে কে জানে! পুঁটি বিপিন উভয়েরই চিন্তার অন্ত নাই। যেদিন ব্যথা ধরিল, সেদিন সেই সরু গলিতে একটি দামী মোটর প্রবেশ করিল এবং মোটর হইতে কাঁচাপাকা-গোঁফ ঝাঁকড়া-ভুরুওয়ালা এক ব্যক্তি অবতরণ করিলেন। লোকটি খর্ব্বাকৃতি। গায়ে দামী শাল, পায়ে দামী জুতা, অনামিকায় দামী আংটি। ভদ্রলোক নামিয়া প্রশ্ন করিলেন, এগারো নম্বর বাড়ি কোন্‌টা?

পাড়ার এক ব্যক্তি খোলার ঘরগুলি দেখাইয়া দিল।

ওই খোলার ঘরগুলো?

আজ্ঞে হ্যাঁ। বাড়ির মালিক সামনের ঘরটায় থাকেন, পেছনের ঘরগুলো ভাড়া দেন। সবগুলোরই এক নম্বর।

কি দুর্দ্দৈব!

অস্ফুট কণ্ঠে কথাগুলি উচ্চারণ করিয়া ভদ্রলোক আগাইয়া গেলেন। বাড়ির মালিক সম্মুখের দাওয়ায় বসিয়া ছিলেন।

আপনিই কি এই বাড়ির মালিক?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

আপনার বাড়িতে বিপিন ব'লে কি কোন ভাড়াটে থাকে?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

তার স্ত্রীর নাম কি পুঁটি?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

তিনি কি আসন্নপ্রসবা?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

কবে নাগাদ ছেলে হবে বলতে পারেন আপনি?

আজই হতে পারে, শুনছি ব্যাথা ধরেছে।

ও, তাই নাকি? তা হ'লে তো দেরি করা ঠিক হবে না। এই রঘুবীর সিং, তুমি গিয়ে ওদের নিয়ে এস তা হ'লে, জল্‌দি।

মোটর নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল। ভদ্রলোক পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া রোয়াকটা ঝাড়িয়া বসিতে যাইতেছিলেন, বাড়িওয়ালা বাধা দিল।

ওখানে বসবেন না, আমি মোড়া বার ক'রে দিচ্ছি।

মোড়ায় উপবেশন করিয়া ভদ্রলোক একটি সিগার ধরাইলেন এবং বলিলেন; এখানে নহবৎ বসাতে চাই, তার ব্যবস্থা ক'রে দিতে পারবেন ?

নহবৎ ? কেন ?

কেন পরে বলছি। ব্যবস্থা ক'রে দিতে পারবেন ?

এখানে কি ক'রে ব্যবস্থা হয় এখন !

হুঁ, মুশকিল বটে। আচ্ছা, ফুটপাতে ব'সেই বাজাবে। এপাড়ায় যতগুলো শাঁখ আছে যোগাড় করুন। পুঁটি-মায়ের ছেলে হবামাত্র বাজাতে হবে। প্রত্যেক শাঁখের জন্যে আমি নগদ দশ টাকা ক'রে দেব। যোগাড় করতে পারবেন ?

এক্ষুনি। তা হবে না কেন ?

বিস্মিত বাড়িওয়ালা বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া রহিল।

যান তা হ'লে, দেরি করবেন না।

পকেট হইতে এক শত টাকার একখানি নোট বাহির করিয়া বাড়িওয়ালার হস্তে দিলেন, বাড়িওয়ালা দ্রুতপদে

বাহির হইয়া গেল। বিস্ময়কর খবর রটিতে বিলম্ব হইল না, দেখিতে দেখিতে ভিড় জমিয়া গেল। রঘুবীর সিং আসাসোঁটাধারী জরির পাগড়ি পরা একদল বরকন্দাজ আনিয়া সারি সারি দাঁড় করাইয়া দিল। নহবৎও লইয়া আসিল। তাহারা ফুটপাতে বসিয়াই আশাবরী রাগিণী বাজাইতে লাগিল। একজন ডাক্তার ও নার্স আসিয়া পুঁটির তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত হইলেন।

কৌতূহলী জনতার আগ্রহাতিশয্যে খর্ব্বাকৃতি ভদ্রলোক আসল ব্যাপারটি অবশেষে খুলিয়া বলিলেন।

রাজা নেহাল সিং আমার মনিব ছিলেন। লক্ষাধিক টাকার সম্পত্তি রেখে অপুত্রক অবস্থায় তিনি মারা যান। আমাকে তিনি খুবই স্নেহ করতেন, সমস্ত সম্পত্তি আমাকেই দিয়ে গিয়েছিলেন। কাল রাত্রে হঠাৎ এক আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখলাম। আমার মনিব যেন আমাকে বলছেন, ঐশ্বর্য্যের সুখ তো অনেক ভোগ করেছি, দারিদ্র্যের সুখ কি তাও একবার ভোগ করবার ইচ্ছে আছে। কাল আমি এক দরিদ্রের ঘরে জন্মাব, আমার মায়ের নাম পুঁটি, বাবার নাম বিপিন, ঠিকানা এই। ঠিকানাটা দিয়েই তিনি অন্তর্দ্ধান করলেন, আমারও তখন ঘুম ভেঙ্গে গেল। সকালে উঠে ভাবলাম, একবার

খোঁজ নিয়ে আসি। সত্যিই যদি তিনি আবার আসেন, তা হ'লে তাঁর অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করতে হবে। খোঁজ নিয়ে দেখছি, স্বপ্ন মিথ্যে নয়। তাই সামান্য একটু ব্যবস্থা করেছি। আপনারা পাড়াসুদ্ধ সকলের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করুন, খরচ যা লাগে আমি দেব। বিপিনবাবু এখনও ফেরেন নি? তাঁর ছেলের সম্পত্তিও তাঁর হাতে আমি ফিরিয়ে দিতে চাই, বুঝলেন।

হঠাৎ বাড়ির ভিতর হইতে বহু শঙ্খ একসঙ্গে বাজিয়া উঠিল। রাজা নেহাল সিং জন্মগ্রহণ করিলেন। নহবতে আশাবরী তখন জমিয়া উঠিয়াছে।

নন্দী ক্ষ্যাপা

ট্রেণ থেকে নেবেই একটি দুঃসংবাদ পেলাম—'কনেক্সন্' 'মিস্' করেছি। পরবর্ত্তী ট্রেণের জন্য সাত ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে। সময় কাটাবার কোন আয়োজন বা উপকরণ সঙ্গে নেই। বন্ধু নেই, পরিবার

নেই, এমন কি একখানা বই পর্য্যন্ত নেই। সম্বলের মধ্যে ছোট একটি সুটকেশ—তাতে খান দুই কাপড়, গামছা, কামাবার সরঞ্জাম ছাড়া আর কিছু নেই। ষ্টেশনের দিকে চেয়েও সান্ত্বনা পাবার মতো চোখে পড়ল না কিছু। ছোট ষ্টেশন। হুইলার নেই। গোটা দুই ফেরিওলা, কয়েকটা কুলি এবং জন দুই ষ্টেশনের বাবু (তাঁরাও কাজে ব্যস্ত)—এদের কেউ আমার সমস্যার সমাধান করতে পারবে না। সাত ঘণ্টা চুপ করে' বসে থাকাও তো মুস্কিল।

সুটকেসটি হাতে ঝুলিয়ে ষ্টেশন থেকে বেরিয়ে পড়লাম। একটু দূর গিয়েই একটি খাবারের দোকান চোখে পড়ল। ঢুকে কিছু খেয়ে নেওয়া গেল। তাকেই জিজ্ঞাসা করলাম, "আচ্ছা, এখানে দেখবার মতো কিছু আছে কাছে-পিঠে? সমস্ত দিনটা কাটাই কি করে?"

"এখানে দেখবার মতো আর কি আছে! তবে নন্দী ক্ষ্যাপাকে যদি দেখতে চান চেষ্টা করতে পারেন।"

"সে আবার কে?"

"সাধক একজন, শ্মশানে থাকে। তবে গেলেই যে দেখা পাওয়া যাবে তার কোন মানে নেই।

নদীর চড়ায় কখন কোথায় থাকে কেউ বলতে পারে না—মন মরজি—"

"শ্মশান কত দূর এখান থেকে ?"

"আধ ক্রোশটাক হবে—এই রাস্তা ধরে' চলে গেলেই দেখতে পাবেন। মা-কালীর মন্দির আছে—"

কি আর করি, শ্মশানের দিকেই অগ্রসর হলাম।

বেশ ভাল লাগল। চমৎকার নির্জ্জন জায়গা। পাশ দিয়ে একটি নদী বইছে। নদীর ধারেই কালী-মন্দির। মন্দিরের চার দিকে পাকা প্রশস্ত বারান্দা। মন্দিরে কেউ নেই, কোথাও কেউ নেই। মন্দিরের কপাট খোলা রয়েছে। সামনে দাঁড়াতেই কালীপ্রতিমা চোখে পড়ল। লেলিহ-রসনা ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি। প্রণাম করলাম। একটা বলিষ্ঠ কালো কুকুর মন্দির থেকে বেরিয়ে এল, ক্ষণকাল আমার দিকে চেয়ে রইল, তার পর চলে গেল। আমি নদীর ধারের বারান্দাটায় গিয়ে চুপ করে' বসে রইলাম। বারান্দার নীচেই খানিকটা জমি, তারপরই কণ্টকাকীর্ণ নদী তীর, ঝোপ

ঝাড়ে পরিপূর্ণ, গোটাকয়েক গ্রন্থিল আশশেওড়া গাছ নদীর উপর ঝুঁকে আছে। চতুর্দ্দিক কেমন যেন খাঁ খাঁ করছে, একটি পাখী পর্য্যন্ত ডাকছে না। দিনের বেলাও গা ছম ছম করতে লাগল। তবু কিন্তু উঠে পালিয়ে আসতে পারলাম না। অদ্ভুত একটা আকর্ষণী শক্তি আমাকে যেন টেনে বসিয়ে রেখে দিলে। বসে রইলাম। সমস্ত মনটা উদাস হয়ে আসতে লাগল ক্রমশঃ। কতক্ষণ বসে ছিলাম জানি না—হঠাৎ একটা কান্নার শব্দে আমার আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গেল। মন্দিরের সামনের দিক থেকে কান্নাটা আসছে মনে হ'ল। উঠে সেদিকে গেলাম। গিয়ে দেখি একটা মড়া এসেছে। মড়া বয়ে এনেছে জন ছয়েক লোক, তাছাড়া সঙ্গে দুটি স্ত্রীলোক রয়েছে। একটি কম বয়সী—বছর ষোল হবে—আর একটি প্রৌঢ়া। একজন স্ত্রী, একজন মা। দুজনেই খুব কাঁদছে। শুনলাম সর্পাঘাতে মারা গেছে লোকটি। কে যেন ওদের বলেছে যে নন্দী ক্ষ্যাপা যদি কৃপা করে তাহলে ও বেঁচে যাবে। সেই আশায় এসেছে ওরা।

একজন আমাকে জিজ্ঞাসা করলে—"কতক্ষণ এসেছেন আপনি?"

"প্রায় ঘণ্টাখানেক হবে!"

"নন্দী বাবার দর্শন পেয়েছেন ?"

"না, আমি তো কাউকেই দেখি নি।"

শ্মশানের ডোমটাও এসে জুটেছিল। সে বললে—"এখন ব'স খানিক—উ কখন যে কুথায় থাকে—কেউ বলতে লারে—"

সঙ্গে সঙ্গে মড় মড় করে, শব্দ হ'ল একটা। ফিরে দেখি নদীর ধারের ঝোপ ঝাড় কাঁটা বন ভেঙ্গে আবির্ভূত হচ্ছেন নন্দী ক্ষ্যাপা। বিরাট পুরুষ। ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। জবা ফুলের মতো লাল চোখ। সম্পূর্ণ উলঙ্গ। সর্ব্বাঙ্গে কাদা মাখা। বিরাট একটা মত্ত মহিষ যেন। সবাই সন্ত্রস্ত হয়ে এগিয়ে গিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করলে। আমিও করলাম।

"কি চাস এখানে ?"

ওদের মধ্যে মাতব্বর গোছের একজন এগিয়ে এসে সসম্ভ্রমে ব্যাপারটা নিবেদন করলে। শোনামাত্র লোকটা যেন ক্ষেপে গেল।

"বেরো শালা—বেরো—বেরো—বেরো বলছি এখান থেকে—"

একটা পোড়া কাঠ পড়ে ছিল তাই নিয়ে তাড়া

করলে। পুরুষগুলো ঊর্দ্ধশ্বাসে পালাল। মেয়ে দুটি বসে রইল।

"তোরা আবার বসে রইলি কেন, যা না—"

তারা নড়ে না।

"ওঠ, ওঠ বলছি—"

তারা মাথা নীচু করে, কাঁদতে লাগল বসে' বসে'। তখন নন্দী ক্ষ্যাপা যা মুখে এল তাই বলে গাল দিতে লাগল। সে ভাষা এত অশ্লীল যে লেখা যায় না। কতকগুলো ইট পড়েছিল কাছে তাই তুলে মারতে লাগল ছুঁড়ে ছুঁড়ে। আমি আর এ দৃশ্য দেখতে পারলাম না। সত্যি কথা বলতে কি, ভয়ও করছিল। আমি তাড়াতাড়ি মন্দিরের পিছনের বারন্দায় গিয়ে আশ্রয় নিলাম। ভাবলাম সবাই চলে গেলে আস্তে আস্তে সরে পড়া যাবে। সমস্ত মনটা ঘৃণায় বিরক্তিতে ভরে উঠেছিল। ইনিই সাধক। এরই এত নামডাক। ছি—ছি—ছি! এই করেই দেশটা অধঃপাতে যাচ্ছে।

হঠাৎ গালাগালির শব্দ থেমে গেল। মন্দিরের ভিতর পদশব্দ পেলাম। তার পরই—

"মা, সত্যিই বড় দুঃখী ওরা—যদি পারিস বাঁচিয়ে

দে; বাঁচিয়ে দে মা—তুই দয়াময়ী, ইচ্ছে করলে সব পারিস—" নন্দী ক্ষ্যাপার কণ্ঠস্বর।

তাড়াতাড়ি সামনের দিকে এগিয়ে এলাম। এসে দেখি নন্দী ক্ষ্যাপা মন্দির থেকে নেমে যাচ্ছে। কারও দিকে ফিরে চাইলে না। ঝোপ ঝাড় ভেঙ্গে সোজা নেমে গেল নদীর খাতের মধ্যে।...

ফেরবার সময় দেখলাম মড়া আগলে মেয়ে দুটি তখনও বসে কাঁদছে। কষ্ট হ'ল। একটা বদ্ধ পাগলের উপর বিশ্বাস করে' কি দুর্ভোগ এদের।

ষ্টেশনে ট্রেণের অপেক্ষায় বসে ছিলাম। হঠাৎ ষ্টেশনের বাইরে একটা সোরগোল উঠল। বেরিয়ে এলাম। এসে দেখি ভীড়ের মধ্যে সেই মেয়ে দুটি—তাদের মুখে হাসি ফুটেছে—আর তাদের সঙ্গে একটি যুবক। সবাই বলাবলি করছে—আশ্চর্য্য ক্ষমতা লোকটার। মড়াকে বাঁচিয়ে দিলে? আশ্চর্য্য!

নির্ব্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।